আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব

Love and Psychology in the Fiction of Alauddin Al Azad

রেহেনা ইয়াসমিন
রেজিস্ট্রেশন নং : ৮২
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর : ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

এম. ফিল. গবেষণার শিরোনাম

আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব

Love and Psychology in the Fiction of Alauddin Al Azad

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

রেহেনা ইয়াসমিন
রেজিস্ট্রেশন নং : ৮২
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে 'আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব' (Love and Psychology in the Fiction of Alauddin Al Azad) শিরোনামে এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করলাম। আমার জানামতে, উল্লেখিত শিরোনামে এ পর্যন্ত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পন্ন হয়নি বা কোনো গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়নি।

অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী স্যারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটি আমার মৌলিক গবেষণা; এটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং সাক্ষাৎকার ব্যতীত অবশিষ্ট উপস্থাপন, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং বিরচনা আমার নিজস্ব।

রেহেনা ইয়াসমিন
এম. ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৮২
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৬০০০; ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৫১৬৭৮১০
ই-মেইল: bengali@du.ac.bd

Department of Bangla
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Call: 88-09666911463/6000; Fax: 880-2-55167810
E-mail: bengali@du.ac.bd

তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০২৩

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে, রেহেনা ইয়াসমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব শীর্ষক (Love and Psychology in the Fiction of Alauddin Al Azad) অভিসন্দর্ভ রচনা করে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করছেন। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৮২, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০, গবেষণায় যোগদানের তারিখ ০৪.০৩.২০২০।

আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভটি তার একক ও মৌলিক গবেষণা, যা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। গবেষককে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা : ১

সার-সংক্ষেপ : ২-৫

পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পটভূমি ৬-৩০

প্রথম অধ্যায় : পঞ্চাশের দশকের পরিপ্রেক্ষিত ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ : আলাউদ্দিন আল আজাদের মানস গঠন ৩২-৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পঞ্চাশের দশকের পরিপ্রেক্ষিতে আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্য একটি ৩৮-৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় : আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব ৪৩-৭০

তৃতীয় অধ্যায় : আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব ৭১-৯৬

চতুর্থ অধ্যায় : আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ ৯৭-১৩৭

উপসংহার : ১৩৮-১৪১

পরিশিষ্ট : ১৪২-১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থী হিসেবে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ একজন কথাসাহিত্যিকের ওপর গবেষণা করার তাগিদ অনুভব করতাম। বাংলা একাডেমিতে যোগদান করার পর গবেষণার প্রতি তীব্র অনুরাগ তৈরি হয়। বাংলা একাডেমির গবেষণামুখী কর্মপরিবেশ আমাকে গবেষণার কাজে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকলেও বাংলা একাডেমির অসংখ্য গুণগ্রাহী ও সহকর্মীর উৎসাহ গবেষণা সম্পাদনে অবদান রেখেছে।

আমি এ ক্ষণে আমার পরম শ্রদ্ধেয় গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এম. ফিল. রেজিস্ট্রেশন, গবেষণাপদ্ধতি নির্ধারণসহ সামগ্রিক কাজে স্যারের আন্তরিকতাপূর্ণ দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্যারের তাগিদ ও মূল্যবান পরামর্শ ব্যতীত এ গবেষণা কখনো আলোর মুখ দেখত না। স্যারকে বিনীত ধন্যবাদ জানাই।

এম. ফিল. প্রথম পর্বে আমার কোর্স শিক্ষক ছিলেন বাংলা বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর ফাতেমা কাওসার। অন্য আরেকটি কোর্সের শিক্ষক ছিলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। দুজন শিক্ষকের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। প্রথম পর্ব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিকল্পে স্যারদের এসাইনমেন্টগুলো লেখার মান বৃদ্ধিতে আমাকে সাহায্য করেছে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার এ দুজন শিক্ষককে।

'আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব' শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে প্রস্তুতকৃত এই অভিসন্দর্ভ রচনায় বাংলা বিভাগ সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। ধন্যবাদ জানাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

আমার পরিবারের সব সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে আমার স্বামী ইফতেখাইরুল করিমকে, যিনি আমার পাশে থেকে আমাকে অনবরত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তার সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়তো সম্ভব হতো না। গবেষণাকালীন আমার স্নেহবঞ্চিত পুত্র আদিবকেও ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা সহজতর করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য বাংলা একাডেমির সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাদের সবাইকে।

রেহেনা ইয়াসমিন
এম. ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং : ৮২

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

কথাসাহিত্যের অন্যতম শাখা উপন্যাস ও ছোটগল্প। কথাশিল্পী যেহেতু সমাজ পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠেন ফলে কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত লেখকের বাস্তবানুগ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে প্রযুক্ত হয় নানা তত্ত্ব ও তথ্য। বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের সাহিত্যে উপস্থাপিত বিষয়াবলি স্বতন্ত্র হলেও কালের প্রতিনিধিত্ব বিচারে সমকালীন যুগমানসকে ধারণ করে সাহিত্য। কাজেই কথাসাহিত্য সমাজ নিরীক্ষার বাস্তবানুগ উপস্থাপন।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উন্মেষ পর্বে উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলালের* মধ্য দিয়ে উপন্যাসের যাত্রা শুরু হলেও ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর মধ্য দিয়ে সার্থক বাংলা উপন্যাসের পথপরিক্রমা শুরু হয়। অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্প শিল্পমানের সত্তায় উপনীত হয়। উপন্যাস ও ছোটগল্পের ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের ষাটের দশকে প্রেম ও মনস্তত্ত্বধর্মী কথাসাহিত্য সৃজন প্রক্রিয়ার পথচলা শুরু হয়।

বিশ শতকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ডি ইয়ুং এঁদের তত্ত্বের প্রতিফলনে চরিত্র সৃজনের যে প্রয়াস বিশ্বসাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় তারই ধারাবাহিকতায় আলাউদ্দীন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর কথাসাহিত্যে পাশ্চাত্য অনুধ্যানে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তার পূর্বাপর বিশ্লেষণ এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনার প্রেক্ষিতে লেখকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্রিকতা অন্বেষণ এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

'আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব' গবেষণা পাণ্ডুলিপির চারটি অধ্যায়ে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত প্রেম ও মনস্তত্ত্বের স্বরূপ; লেখকের মানসগঠন, লেখকের উন্মেষপর্ব এবং প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

'পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পটভূমি' অংশে কথাসাহিত্যের অন্যতম শাখা উপন্যাস ও ছোটগল্পের উন্মেষ, বিকাশ ও আধুনিককালের উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রবণতাসমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের উপন্যাস অংশে উপন্যাসের ধারায় বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স (১৮২৬-১৯৬৩) থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮৪১-১৮৮৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের প্রবণতাসমূহ আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৭-পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) পর্যন্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় প্রবণতার দিকে আলোকপাত করা হয়েছে।

অপরদিকে ছোটগল্প অংশে ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ, উন্মেষ ও বিকাশপর্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অংশে বাংলাদেশের ছোটগল্প (১৯৪৭-বর্তমান) অংশে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আবু রুশদ (১৯১৯-২০০৮), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) প্রমুখ সাহিত্যিকের ছোটগল্পের প্রবণতাসমূহ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় কাহিনি সংস্থান ও চরিত্রায়ণ কৌশলে এঁদের প্রকরণশৈলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কথাসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত অধ্যায়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উন্মেষপর্ব থেকে শুরু করে আলাউদ্দিন আল আজাদ পর্যন্ত কথাসাহিত্যিকদের বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

'প্রথম অধ্যায় : পঞ্চাশের দশকের পরিপ্রেক্ষিত' অংশে আলাউদ্দিন আল আজাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, আশৈশব শিল্প-সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। মাধ্যমিক শ্রেণি (১৯৪৬) থেকে আমৃত্যু (৩রা জুলাই ২০০৯) পর্যন্ত তাঁর রচিত কথাসাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে আজাদের মানসগঠন, সাহিত্যচর্চার উন্মেষপর্ব, পাঠাভ্যাস বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তার স্মৃতিচারণমূলক লেখা, গবেষণাপ্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রাসঙ্গিকভাবে এ আলোচনায় যুক্ত করা হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের জীবনী পাঠ করে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযুক্ত করে আশৈশব তাঁর বই পড়ার প্রবণতা, চরিত্র সৃজনের তাগিদে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, ঢাকায় আগমন, কলেজে ভর্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া, শিক্ষকতা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে আলোচনাভুক্ত করে আজাদের দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় সংক্ষিপ্ত ক্যানভাস অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে।

'দ্বিতীয় অধ্যায় : আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব' অংশে আলাউদ্দিন আল আজাদের মার্কসবাদী সাহিত্যাদর্শ থেকে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বাশ্রয়ী হয়ে *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০), *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২), *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* (১৯৮৬), *অনূদিত অন্ধকার* (১৯৯৩) এবং *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* (১৯৯৩) উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। তিনি এ উপন্যাসগুলোতে নর-

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্ব উন্মোচনের পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সূত্র ধরে এসব উপন্যাসকে শিল্পমানে উত্তীর্ণ করেছেন। আজাদের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে এসব উপন্যাসের চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে সমাজের সার্থক প্রতিনিধি। নর-নারীর প্রেম ও যৌনাকর্ষণের রূপায়ণে তাঁর উপন্যাস ফ্রয়েডীয় তত্ত্বাশ্রয়ী প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে* শিল্পীর আত্মকথন ও মনস্তাত্ত্বিক জটিল বাস্তবতা; *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসে বিলকিস নামক বিধবার যৌনাবেগের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। কন্যার জামাইয়ের সঙ্গে বিগত যৌবনা বিলকিসের মনোজগতে কামজ প্রেমানুভূতির সৃষ্টি হয়। এ উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে মনোবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* উপন্যাসে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ঘটে যাওয়া যৌননিপীড়ন এবং তার মায়ের সঙ্গে অন্য যুবকের যৌনসঙ্গম তাকে মনোজাগতিক জটিল অন্তর্বাস্তবতার গহিনে নিয়ে যায়। এ উপন্যাসের আলোচনায় এসব যুক্ত করে আলোচনা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* ও *অনূদিত অন্ধকার* উপন্যাসদ্বয়ে প্রেম, মনস্তত্ত্ব ও মানব জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে অজানা সুড়ঙ্গে নতুন আবিষ্কারের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় সমর্পিত হয়েছে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা। মার্কসবাদী আজাদ ফ্রয়েডে আগ্রহী হয়ে মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে যে প্রয়াস পেয়েছেন তা এ অধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্ত করে আলোচনা সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

'তৃতীয় অধ্যায় : আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব' অংশে 'বৃষ্টি, 'পাশবিক', 'এক জোড়া নীলচোখ', 'কবি', 'ধোঁয়া', 'জীবন জমিন', 'উজান তরঙ্গে', 'যখন সৈকত', 'অন্ধকার সিঁড়ি', 'রত্না আমি ও একটি কুকুর', 'পরী', 'চুরি' গল্পগুলো বিশেষভাবে প্রেম ও যৌনতা-উদ্ভূত মনস্তত্ত্ব-নির্ভর গল্প। সমকালীন সমাজের বাস্তবতায় এসব গল্পে প্রেম, ব্যর্থ প্রেম এবং কখনো-বা প্রেমাবেগের টানে যৌনতায় উপনীত হয়ে পরিণতিহীন প্রেমের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। ষাটের দশকে আজাদ প্রেমের বিপরীতে কামজ-প্রভাবে উদ্বুদ্ধ মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তের যে রূপায়ণ এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন সেসব আলোচনায় যুক্ত করে আলোচনাকে পরিপূর্ণ করে আজাদের গল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

'চতুর্থ অধ্যায় : আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ' অংশে আজাদের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলোতে উপস্থিত প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শৈলী বিচার করা হয়েছে। কথাসাহিত্যের শিল্প প্রকরণ বা শৈলীবিচারে কাহিনি, প্লট, চরিত্রায়ণ, কৌশল, ভাষা পরিচর্যা, অলংকার, দৃষ্টিকোণ আবশ্যিকভাবে যুক্ত হয়। আজাদের ছোটগল্প ও উপন্যাসের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেম ও মনস্তত্ত্বপ্রধান ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলোতে প্রতিফলিত শিল্পপ্রকরণকে তুলে ধরে প্রেম ও মনস্তত্ত্বকে

Dhaka University Institutional Repository

কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু করার ক্ষেত্রে লেখকের মুনশিয়ানা প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় যুক্ত করে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্নকরণে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎসের পাশাপাশি বিভিন্ন বই, জার্নাল, ই-জার্নাল, পত্রিকা, ই-পত্রিকার সূত্র যুক্ত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় চেতনা বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাববোধ থেকে বিভিন্ন সূত্র মারফত পাওয়া তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় ষাটের দশকে বিক্ষুব্ধ সময়ে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বাশ্রয়ী আজাদের কথাসাহিত্যের বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কল্লোল গোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ১৯৩০-এর দশকে সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বাশ্রয়ী হয়েছেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) প্রমুখ সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে নর-নারী সম্পর্কের যৌনাবেগের তীব্রতম আকর্ষণের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁদের কথাসাহিত্যে। বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত কথাশিল্পী আজাদ ফ্রয়েডীয় লিবিডোতাড়িত মানব মনস্তত্ত্ব সহযোগে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন-প্রয়াসী ছিলেন। প্রেম ও মনস্তত্ত্বের উপস্থাপনে আজাদের কথাসাহিত্য মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচন সূত্রে এ গবেষণাকর্মটি বাংলা সাহিত্যধারায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিত : বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমি

সাহিত্যের সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। সাহিত্যিকের রচনায় স্বভাবতই সমাজের রূপায়ণ ঘটে বলেই সাহিত্যিকের কল্পলোকে সমাজ মানসের প্রতিফলন ঘটে। মানুষের জীবনের নানামাত্রিক ঘটনা ও সমাজকে অবলম্বন করেই রচিত হয় কথাসাহিত্য। সাধারণভাবে কল্পনার ভিত্তিতে সৃষ্ট যে কোনো কাহিনি তথা সাহিত্যকে কথাসাহিত্যে বলে। ইংরেজিতে একে বলা হয় Fiction। কথাসাহিত্য বলতে প্রধানত উপন্যাস ও ছোটগল্পকে বোঝায়।

উপন্যাসের ইংরেজি সমার্থক শব্দ Novel, যা ল্যাটিন 'Novellus' বা 'Novus' থেকে জাত। এই Novellus থেকেই Novel কথাটির উৎপত্তি। আর এই উপন্যাস হচ্ছে কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধারা। উপন্যাস ও এর শিল্পবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> উপন্যাসের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। দ্বন্দ্বময় চরিত্র সৃজনে সফল হলে ভালো নাটক সৃজিত হয়। অনুভূতিকে চিত্রকল্পময় করতে পারলে কবিতার প্রাথমিক সাফল্য আসে। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করতে না পারলে উপন্যাস ব্যর্থ। জীবনের গোটা রূপ উপন্যাসকারের ধ্যেয়। জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ রেখেই উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হেনরি জেমস্ তাঁর সুবিখ্যাত 'Art of Fiction' প্রবন্ধে বলেছেন : As people feel life, so they will feel the art that is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of the effort of the novel.[১]

উপন্যাসে থাকে একটি প্রধান বা মূল গল্প। এই গল্পটিকে গড়ে তোলার জন্য থাকতে পারে পার্শ্বগল্প। মূলত উপন্যাসে থাকে গদ্যকাহিনি। ঔপন্যাসিক যে গল্পটি নির্মাণ করেন, সেটি নির্মাণ করা হয় বর্ণনার সাহায্যে, গদ্য আর সংলাপের মাধ্যমে। সুবিন্যস্তভাবে এর কাহিনিকে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। বাংলায় ব্যবহৃত উপন্যাস শব্দটির মধ্যেও এই বিন্যাসের কথা আছে। 'উপ' উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ন্যাস'। এই ন্যাসই বিন্যাস। উ+নি+আস+অ=উপন্যাস। সাহিত্যের বিশেষ রূপ হিসেবে উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া খুব সহজ নয়। এর আকার আর প্রকৃতি নিয়ে রয়েছে ভিন্ন মত। ফলে এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ দেওয়া কঠিন। তবু এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে :

শ্রীশচন্দ্র দাস :

> গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনি অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে।[২]

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় :

---

১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০, কলিকাতা, পৃ. ৪

২ শ্রীশচন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন*, দি এলিট প্রেস, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

> ইংরেজিতে নভেল এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য সংরূপ। গদ্যে লেখা সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক সাহিত্যকর্ম। তুলনায় নমনীয় ও মুক্তফর্মবিশিষ্ট রচনা। অন্যান্য সাহিত্য-সংরূপের মতো কোনও নির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই। কোনও সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যও নেই।[৩]

ই. এম. ফস্টার :

> উপন্যাস হচ্ছে সুনির্দিষ্ট আয়তনের গদ্য কাহিনি (Prose of a certain extent), ঔপন্যাসিক যে গল্পটি নির্মাণ করেন সেটি নির্মাণ করা হয় বর্ণনার সাহায্যে।[৪]

সাধারণভাবে বলা যায়, উপন্যাস কোনো ঐতিহাসিক, কাল্পনিক বা বাস্তবকাহিনি যা চরিত্র বিশ্লেষণ, ঘটনার সঙ্গে সংলাপের সংযোগে লেখকের ব্যক্তিক অনুভূতিজাত দর্শনের শিল্পিত প্রকাশ। উপন্যাসের শরীর গঠনে ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের কথা বলেছেন উইলিয়াম হাডসন :

> Plot, characters, dialogue, time and place of action style and a stated or implied philosophy of life they are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad.[5]

অর্থাৎ উপন্যাসের শরীরে কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, স্থান, স্টাইল এবং লেখকের জীবনদর্শনের আলোকে গড়ে উঠবে যে কোনো কথাসাহিত্য। জীবনকে দেখার এই ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি শুরু হয়েছিল ইউরোপে– মধ্যযুগে সামন্তবাদী সমাজের ভ্রূণে যে পুঁজিতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল, সেখান থেকেই শিল্পবিপ্লবের সূচনা (১৭৬০-১৮৩০)। তারপর ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) অভিঘাতে মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের পরিবর্তন সূচিত হয়। যান্ত্রিক স্বাগতিকতা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজ রোপণ করে। ফিউডাল অধ্যাত্ম বিশ্বাস থেকে সরে এসে মানুষ যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। আত্মজিজ্ঞাসায় খুঁজে পায় 'সবার উপরে মানুষ সত্যের' বাণী। বণিকতন্ত্রের প্রয়োজনে এশিয়া-আমেরিকার জলপথের সন্ধান ইউরোপীয় জনজীবনে নবতরঙ্গের উন্মোচন ঘটায়। সমাজে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তির জীবননীতি ও পছন্দ-অপছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য তীব্রতর হয়। ব্যক্তিবিদ্রোহের স্রোতধারায় পুরাতন মধ্যযুগীয় দরবারি তোষণ-সংস্কৃতি শ্বাসরুদ্ধ হয়। ফলে নতুন শিল্পরীতির জাতক হিসেবে আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের।

উপন্যাস আধুনিককালের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে মাত্র দেড় শ বছর আগে ইংরেজি উপন্যাসের আদলে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। তবে প্রাচীন সংস্কৃত কাহিনি কাব্য, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধ জাতকের গল্প, মধ্যযুগের রূপকথা, মৈমনসিংহ গীতিকা, রোমান্টিক কাহিনি কাব্য, নাথ, সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, আরব্য উপন্যাস, লোকগাথা এসবের মধ্যে উপন্যাসের বীজ খুঁজে পেয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটলে

---

৩ সুরভী বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য শব্দার্থকোষ*, বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২০৯

৪ E. M. Forster, Aspects of Novel.

৫ William Henry Hudson, *An introduction to the study of literature*, G. G. H. Co. Ltd., London, Reprint 949, p. 131

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতাকে কেন্দ্র করে একদিকে ব্যাপক নগরায়ণ, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে মানবিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা ও সাময়িকপত্রের প্রসার, সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দ্বারা সমাজ ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। নতুন কালের নতুন সমাজের কথা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করতে থাকে। উদ্ভবকাল থেকেই উপন্যাস কল্পিত আখ্যানাশ্রয়ী জীবনভাষ্য। শত আয়োজনেও উপন্যাস সার্থক হয়ে ওঠে না যদি না তাতে পূর্ণবৃত্ত জীবনবোধক হয়। বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্বের কথা তুলে ধরেছেন সমালোচক :

> উনিশ শতকের বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রেণিমানসিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, হতাশা-নৈরাশ্য, বিকৃতি-বৈকল্য, বাংলা উপন্যাসে নানাভাবে রূপ লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতকে বাংলা উপন্যাস নিজেকে দ্রুত সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ঘটনা তার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।[৬]

বাংলা কথাসাহিত্যের বিকাশে উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের যোগসূত্র রয়েছে। ইংরেজ আমলে শিক্ষা, সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তারই সূত্র ধরে ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাবে বাংলা কথাসাহিত্য নতুন মাত্রা পায়। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। উপন্যাস শিল্পে সে গদ্যরীতির পূর্ণতা লক্ষণীয়। উপন্যাসের যাত্রা প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> উনিশ শতকের ঋদ্ধ মধ্যবিত্তবর্গের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মাফিক জন্ম নিয়ে জীবনের সঙ্গে সমান্তরালে আরেক জীবনের আভাস তৈরি করেছে উপন্যাস।[৭]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (১৮০০) বাংলা বিভাগ (১৮০১) চালু হবার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য যাত্রা শুরু করে। বাংলা উপন্যাসের পথযাত্রা শুরু হয়েছিল হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স (১৮২৬-১৮৬৩) কর্তৃক রচিত *ফুলমণি করুণার বিবরণ* (১৯৫২)। এই উপন্যাসটি উপন্যাস শাখার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), কালী প্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২) প্রভৃতি রচিত হলেও এগুলোতে উপন্যাসের প্রকৃত রূপ প্রস্ফুটিত হয়নি। বরং বঙ্কিমচন্দ্র রচিত *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) উপন্যাসে উপন্যাসের সার্থক গুণাবলি লক্ষ করা যায়। এরপর বাংলা উপন্যাস উপন্যাসের যাত্রাপথে নতুন মাত্রা যোগ করে পথচলা অব্যাহত রেখেছে। এই পথপরিক্রমায় বাংলা উপন্যাসের ওপর আলোকপাত করে ঔপন্যাসিকদের বৈচিত্র্য উন্মোচন করা প্রয়োজন।

---

৬ দেবীপদ ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের কথা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৪০

৭ তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের সময়* (কলিকাতা : এবং মুশায়েরা, ১৯৯৯), পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা উপন্যাসের পথ পরিক্রমায় প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। *আলালের ঘরের দুলাল* প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

> আলালের ঘরের দুলাল একটি যথার্থ উপন্যাসের সকল লক্ষণ অঙ্গীভূত করেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে।[৮]

বস্তুত *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে প্যারীচাঁদ মিত্র চরিত্র চিত্রণে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> প্যারীচাঁদ ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র বাঙালী লেখক যিনি আঁকাড়া বাস্তবকে উপন্যাসে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নানামুখী সাফল্যের প্রসঙ্গেই ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের চরিত্র স্মরণের যোগ্য এবং বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতকে সহসা-উদ্ভূত নগর-জীবনের অসংগঠিত পরিবেশে ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের চরিত্র প্রতিনিধিস্থানীয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ-কথা উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, যে-ব্যক্তির রূপায়ণ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রধান ব্যাপার, টাইপের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে না।[৯]

প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* প্রকৃত অর্থেই যথার্থ উপন্যাসের লক্ষণ সহকারে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ উপন্যাসে সার্থক উপন্যাসের সকল গুণ অনুপস্থিত ছিল বিধায় পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। তবুও এ উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। সামগ্রিকভাবে এ উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> *আলালের ঘরের দুলালের* ন্যায় গদ্যময় বাস্তবতার দ্বিতীয় নিদর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একমাত্র স্বর্ণলতাতেই কথঞ্চিৎ লভ্য। স্বর্ণলতা যা পল্লী সীমায় সম্ভব করে তুলেছিল তার কথা বাদ দিলে প্যারীচাঁদের সৃষ্টিই এ-ক্ষেত্রে প্রধান প্রথম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই গদ্যময় বাস্তবতার সীমা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখর মননে প্রথম ধরা পড়েছিল বলে বঙ্কিম স্বতন্ত্র ধারানুবর্তী হয়েছিলেন।[১০]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশের পর থেকেই প্রকৃত অর্থে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্র পূর্ণতা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচার করার অভিপ্রায়ে তাঁর উপন্যাসের বিশিষ্টতা তুলে ধরেছেন সমালোচক :

সমগ্র বঙ্কিমী উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ তিনটি–

ক) বিষয়বস্তু বা theme-এর গুরুত্বের বা অসাধারণত্বের ওপর প্রাধান্য আরোপের প্রবণতা।

খ) উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা

---

৮ সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৯ সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১০ সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

গ) মননশীলতাজনিত সুসমতার প্রয়াস।[১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই তিনটি সূত্রের আলোকে বিচার করলে শিল্পী বঙ্কিমের নির্মাণশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসগুলোতে গঠনরীতির নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা তাঁর ক্লাসিক শুদ্ধ মনের পরিচায়ক। *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসেও এর পরিচয় মেলে। অরণ্য প্রকৃতির কোলে লালিত ও বর্ধিত কপালকুণ্ডলার সাংসারিক জীবনে অনভ্যস্ততার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। ঔপন্যাসিক এখানে মেহেরুন্নিসা চরিত্রের রূপজ মোহও তুলে ধরেছেন। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের প্রথম দর্শনের প্রেমানুভূতি শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশেছে। *সীতারাম* থেকে *দেবী চৌধুরাণী*, *আনন্দমঠ* প্রভৃতি উপন্যাসে বঙ্কিমের রাজনৈতিক চেতনা-উদ্ভূত প্রকরণ পরিচর্যায় সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল* ও *বিষবৃক্ষের* কাঠামোতে সুষম সময়ের বিন্যাসে তাঁর প্রকৌশল ভাবনা সদর্থক চিন্তার সাক্ষ্যবাহী। *কৃষ্ণকান্তের উইলের* প্রথম পর্বে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় পর্বে পনেরো পরিচ্ছেদে যথাক্রমে এক বছর ও আট বছরের সময়কাল নির্দেশ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের পনেরো পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত সময়কালকে নির্দেশ করেছেন সমালোচক–

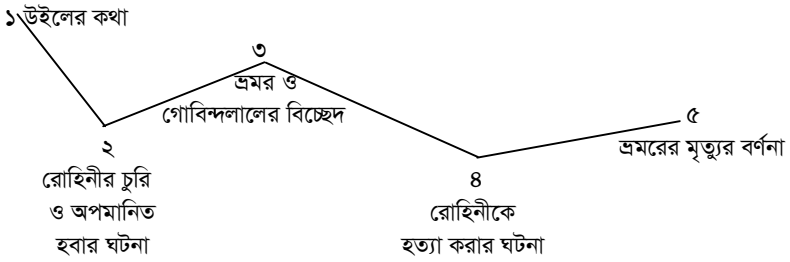

সময়কালের দিক দিয়ে বিচার করলে এক থেকে তিন পর্যন্ত ঘটনাকাল এক বছর এবং তিন থেকে চার পর্যন্ত ঘটনাকালও এক বছর। এক থেকে তিন পর্যন্ত যেক্ষেত্রে একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, তিন থেকে চার পর্যন্ত আসতে সেক্ষেত্রে লেগেছে নয়টি পরিচ্ছেদ। কেননা তিন থেকে চার কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডের ঘটনার তাড়নায় সংগঠিত পরিণাম। নতুন ঘটনা কিছু নয়। চার থেকে পাঁচ, সময়কালের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ছয়টি পরিচ্ছেদে এই গভীর বেদনাবহ কালকে সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্ণনাকালে লেখকের সংযম, পাত্রপাত্রীদের চিঠিপত্রে বাচনে-আচরণে পরিমিতিবোধ ট্রাজেডির দারুণ দুঃখভারের মর্যাদা সর্বত্র রক্ষা করেছে।[১২]

[১১] সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[১২] সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

অসাধারণ উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমের রচনায় বাঙালির জীবনের কাহিনি অনুপস্থিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে উপস্থিত আছে বলে 'ছিন্নপত্র'কে উদ্ধৃত করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> উনিশ শতকের পোষ্যপুত্র বাঙালীর ছবি বঙ্কিমচন্দ্র এঁকে থাকলেও চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলো বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন, কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেননি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্তবাঙালীর কাহিনি কেউ ভালো করে বলেনি। কিন্তু সেই নিভৃত প্রান্তবাসী বাঙালীর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর গল্পগুচ্ছে।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) উনিশ শতকব্যাপী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত ঐতিহাসিক, প্রেম, রোমান্স তথা সামাজিক সমস্যা প্রধান ধারা থেকে সরে এসে বিশ শতকের সূচনালগ্নে সমকালীন প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন প্রেম ও মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে আনলেন উচ্চবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের কথা, তাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তাঁর *চোখের বালি* (১৯০৩), *গোরা* (১৯১০), *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), *যোগাযোগ* (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসে তা স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে বঙ্কিমীয় প্রভাবে প্রভাবিত হলেও *চোখের বালি* এবং তৎপরবর্তী উপন্যাসে তিনি স্বতন্ত্রপথে যাত্রা করে নতুন পথ তৈরি করেন। *চোখের বালি'র* ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।[১৪]

মনস্তত্ত্বপ্রধান *চোখের বালি* উপন্যাসে মানব মনের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে প্রয়াস পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর *চোখের বালির* মানব মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> মানুষের অন্তরাত্মাকে, ঘটনার আঁতের কথাকে টেনে বের করার কাজ ঔপন্যাসিকের, এ-কথা তিনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে মনস্তাত্ত্বিক লেখক হতে গিয়ে তিনি কদাচ একদল মনোচিকিৎসকের গবেষণার বিষয়কে উপন্যাসে জড়ো করেন নি। দেহে-মনে সুস্থ ব্যক্তির কথাই বলেছেন। উপন্যাসের সংস্থানগত সৌন্দর্যের বিষয় সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন এই মনোভাব থেকে।[১৫]

চোখের বালি ব্যক্তিত্বের সংকটমূলক উপন্যাস। বাংলাসাহিত্যের ধারায় মানবমনস্তত্ত্ব ও ত্রিভুজ প্রেমের মনোজাগতিক সংকট বিষয়ে রচিত শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসের সাক্ষ্যবাহী এ উপন্যাস। *চোখের বালি* উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিকধর্মিতা প্রসঙ্গে সত্যব্রত দে লিখেছেন :

---

[১৩] সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[১৪] গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৮

[১৫] সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

> মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-কুশলতা চোখের বালির চরিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিকল্পনায় ভিত্তিগত কোন গূঢ় গভীর সূত্র চরিত্রগুলিকে যেমন স্বাভাবিক তেমনি জীবন্ত করেছে। লেখক বিভিন্ন ঘটনাবর্ণনায়, মন্তব্য বিশ্লেষণে চরিত্রগুলিকে বিকশিত করে সুস্পষ্ট রেখায় চিত্রিত করেছেন।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের এ পর্বের উপন্যাসগুলোতে মানুষের মনোজাগতিক অন্তর্বাস্তবতা প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) নর-নারীর দাম্পত্য সংকট, যৌনতা নিয়ে রচনা করেছেন 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' উপন্যাস। গৃহদাহের অচলা, সুরেশ, মহিম, মৃণালিনীকে নিয়ে কাহিনি গ্রথিত হয়েছে। সুরেশ দেহলোলুপ। অচলার বিপরীতে আদর্শ হিন্দু নারী হিসেবে মৃণালিনীকে উপস্থাপন করেছেন শরৎ। মহিম চরিত্র শুভবোধের পরিচায়ক। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের আত্মজৈবনিক উপন্যাস। ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, অন্নদা দিদি, পিয়ারি বাইজি এসব গ্রামীণ চরিত্রসহযোগে অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। *চরিত্রহীন* : সাবিত্রী, কিরণময়ীসহ অন্যান্যদের নিয়ে গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবনেরই যেন প্রতিচ্ছবি। *গৃহদাহ*তে গ্রামীণ নারীর জীবনের শুদ্ধ-অশুদ্ধ প্রয়াস নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করি তারা বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্গের মানুষ। তাঁর রচিত *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫) প্রভৃতি উপন্যাসে লক্ষ করলে দেখতে পাই, এসব উপন্যাসের চরিত্রেরা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষ বিশেষ। শরৎচন্দ্রের রচনায় উচ্চমধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরের কথা, নারীর কথা এলো সমাজের মানবিকতাবোধ পরিবার ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে। তার চরিত্রগুলো প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে তুলে আনা। তাঁর রচিত *দেবদাস* (১৯১৭), *দেনা-পাওনা* (১৯২৩), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *শ্রীকান্ত* (১৯১৭) উল্লেখযোগ্য। শরৎ-এর প্রতি পাঠকের মুগ্ধতার প্রধান কারণ বাস্তব জীবন অনুষঙ্গে রচিত এসব সাহিত্যকর্ম কালোত্তীর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রাঢ় অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামী জীবনের আখ্যান তার কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু করেছেন। বীরভূমের দুর্ভিক্ষ (ধাত্রীদেবতা) এবং দুই কূল প্লাবিত করা ময়ূরাক্ষী নদী *গণদেবতায়* ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্করের উপন্যাসকে প্রধানভাবে দুটি অংশে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। প্রথম অংশে *ধাত্রীদেবতা, কালিন্দি, গণদেবতা* এবং অন্য অংশে *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, কবি* প্রভৃতি উপন্যাস। *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭) তারাশঙ্করের অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। এ উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের জীবন, তাঁদের সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাস, আচার-আচরণ নিয়ে

---

[১৬] সত্যব্রত দে (১৯৭১), *রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা, জিজ্ঞাসা*, কলিকাতা, পৃ. ১৭৩

আলোকপাত করেছেন। *কবি* (১৯৪১) উপন্যাসে ডোম সম্প্রদায়ের এক যুবকের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ করেছেন। এই উপন্যাসের 'জীবন এত ছোট ক্যানে' সংলাপটি ক্লাসিক মর্যাদা পেয়েছে। *ধাত্রীদেবতা* জমিদার বংশকে কেন্দ্র করে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বর্ণনা উপস্থিত করেছেন এ উপন্যাসে। *গণদেবতা* উপন্যাসে দেবু ঘোষের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক অব্রাক্ষণ চাষির ছেলেকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> *গণদেবতা* উপন্যাসে তারাশঙ্কর মহৎ ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত নিরপেক্ষতায় ও নিরাসক্তিতে ছিরু পালের শ্রী হরি ঘোষের রূপান্তরের কথা এবং তার নবার্জিত শ্রেণি চরিত্রে চিহ্নিত হওয়ার চলচ্ছবি বর্ণনা করেছেন। অদূরবর্তী কঙ্কনার ব্রাহ্মণ বাবুদের শ্রেণিচরিত্র কথাও বাদ যায়নি। *গণদেবতা* উপন্যাসের Structure বা কাঠামো লেখকের বিষয়বোধ ও শিল্পজ্ঞান দুয়েরই নিদর্শন। আন্তরিক স্বোপার্জিত জীবনবোধ ছাড়া এমন কাঠামো-গড়া অসম্ভব।[১৭]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) বিশ শতকের দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম দ্বারা পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন। বিভূতিভূষণের সাহিত্য জগৎ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> সমকালীন সাহিত্যধারায় তিনি দিলেন দলছুট ও ব্যতিক্রমধর্মী। কল্লোলীয় লেখকদের নগর-তৃষিত, বিকৃত ও পঙ্কমথিত জীবনদৃষ্টিকে তিনি গ্রাহ্য করেননি। জীবনের অব্যবহিত প্রয়োজন, প্রতিক্রিয়া, নৈরাশ্য-নৈরাজ্য ও জটিলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি মানবজীবনকে সমগ্র ও অখণ্ড বিবেচনা করেছেন; এবং জীবন বিষয়ক এই উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিপুল সৃষ্টিকর্মে।[১৮]

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ভারতীয় উপমহাদেশ ও বৈশ্বিক আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা, আন্দোলন সংগ্রামের প্রতিক্রিয়ায় কল্লোলীয় লেখকেরা জীবনের জটিলতার চিত্রায়ণে সচেষ্ট ছিলেন। ইতঃপূর্বে উনিশ শতকে বাংলার চিন্তাশীল সাহিত্যিক-দার্শনিকরা মানুষের আচরণ ও কর্মপ্রক্রিয়াকে তার মনোচৈতন্যের জন্য দায়ী বিবেচনা করে সন্তুষ্ট ছিলেন। *কপালকুণ্ডলার* মতিবিবি, *কৃষ্ণকান্তের উইলের* রোহিনী-গোবিন্দলাল-ভ্রমর এসব চরিত্র সৃজনে উপর্যুক্ত মতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কল্লোলীয় পর্বের সাহিত্যিকরা সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ডি ইয়ুং প্রমুখের মনোবিশ্লেষণ সূত্রে অধিসত্তা বা super-ego দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানুষের ক্লেদাক্ত, হতাশাচ্ছন্ন জীবনের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। তবে বিভূতিভূষণ এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারায় হেঁটেছেন। সমালোচকের মন্তব্য :

---

[১৭] সরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

[১৮] গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৫৬

> বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলীয় এই নেতিচেতনায় আস্থাশীল ছিলেন না; লিবিডোর পরিবর্তে তিনি দুঃখ, মমতা ও কারুণ্যকে মানবজীবনের পরম সম্পদ বিবেচনা করেছেন। মানুষের ওপর কখনোই আস্থা হারাননি তিনি। মানুষ ও মানবতা তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে অভিষিক্ত হয়েছে উচ্চমূল্যে।[১৯]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন *পথের পাঁচালী* (১৯২৮) উপন্যাস। এই উপন্যাসে গ্রামীণ প্রকৃতি, মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষের যাপিত জীবনের কথা প্রধানভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। আবহমান বাংলার চিরায়ত সবুজ সুন্দর রূপ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের এ উপন্যাসে। এ উপন্যাসের তিনটি খণ্ড : বল্লালী-বালাই, আম-আঁটির ভেপু, আক্রুর সংবাদ। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> বিভূতিভূষণ প্রায় শতবর্ষব্যাপী বাংলাদেশের একটি নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন; গ্রাম-সমাজের অভাব-দারিদ্র্য, উপায়হীন অনশন, উদারতা-সংকীর্ণতা, মানব চরিত্রের একান্ত ভয়ানক ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কুৎসা, অমানবিক ক্রূর প্রথা, নীরব শান্ত নিষ্ঠুরতা প্রায় কিছুই বাদ যায়নি। অন্যদিকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন এই পৃথিবী-প্রকৃতি, মানুষ ও জীবন কতবেশি সুন্দর।[২০]

পথের পাঁচালী ভিক্টোরীয় রীতির উপন্যাস হলেও লেখক এর শরীরে মিথের ব্যবহার করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। *পথের পাঁচালী* উপন্যাস প্রসঙ্গে সৈয়দ আকরম হোসেন বলেছেন :

> মূলত পথের পাঁচালী–অপরাজিত উপন্যাসের শরীর গঠন ও বিষয়-অন্তর্বয়নে অন্তর্লীনভাবে সক্রিয় থেকেছে অস্থিতে মিথ, শোণিতে সমকাল।[২১]

পথের পাঁচালী উপন্যাসে কাহিনির মধ্যে পৌরাণিক সংগঠন সৃষ্টিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসে অরণ্য প্রকৃতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সমালোচক লিখেছেন :

> আরণ্যকের মূল শক্তি তার ভাষা ভঙ্গিমায় এবং বর্ণনা-রীতিতে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু এ-শক্তির উৎস নিঃসন্দেহে লেখকের সমগ্র চেতনার বিন্যাসে।[২২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বাংলা কথাসাহিত্যের বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পী। ফ্রয়েডীয় লিবিডোতাড়িত মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে সচেষ্ট মানিকের কথাসাহিত্যে মার্কসীয় শ্রেণিসচেতনতা ও বিপ্লবী প্রচেষ্টার আলেখ্যসহযোগে রচিত কথাসাহিত্য হয়ে উঠেছে কালজয়ী। তাঁর প্রথম পর্যায়ে রচিত উপন্যাস

---

[১৯] গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[২০] গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[২১] সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৯

[২২] সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

দিবারাত্রির কাব্য, *পুতুল নাচের ইতিকথা*, *পদ্মানদীর মাঝি*–এ উপন্যাসগুলোতে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষণীয়। অন্যদিকে *চিহ্ন*, *শহরতলী*, *জননী* উপন্যাসে সমাজ কাঠামোর নানা উপাদানকে উন্মোচনে সচেষ্ট ছিলেন মানিক। *পুতুল নাচের ইতিকথায়* শশী-কুসুম মূল আখ্যানের সঙ্গে অনেকগুলো উপ-আখ্যান রচনা করেছেন লেখক। শশী ডাক্তারের মনোজাগতিক উপলব্ধি, কুসুমের অনাগ্রহ-আগ্রহের দ্বন্দ্বময় উপস্থাপনে শেষ পর্যন্ত শশী-কুসুমের প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। গাওদিয়ায় বেড়ে ওঠা গোপালের পুত্র শশী ডাক্তার মধ্যবিত্তের জীবনের ব্যর্থতার প্রতিভূ। অন্যদিকে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে মাঝি কুবের ও কপিলার অচরিতার্থ প্রণয়ের পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়ে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। প্রেম ও কামজ প্রভাবে প্রভাবিত এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা শেষ পর্যন্ত প্রণয়ে সমর্পিত হয়েছে। মানিকের *চিহ্ন* উপন্যাসে ভারতবর্ষের ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানস্থল কলকাতার ধর্মতলা মোড়ে সংঘটিত আন্দোলনের পূর্বাপর ঘটনার বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। মানিকের কথাসাহিত্যে সংঘবদ্ধ মানুষের বিপ্লবী প্রচেষ্টার স্মৃতিবাহী এ উপন্যাস *চিহ্ন* প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

> বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই। এ ধরনের কাহিনি, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।[২৩]

প্রথাগত প্লট বা কাহিনি, ঘটনার যথাযথ বিন্যাস এবং কালগত বিন্যাস নেই এ উপন্যাসে। ফলে এটি উপন্যাস হিসেবে সার্থক না হলেও সদর্থকতার পরিচায়ক। মানিকের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথাগত অর্থে মার্কসিস্ট নন; তিনি শিল্পী, জীবনের রূপকার। প্রথম পর্যায়ে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন লিবিডোকে, তারপর তাঁর লেখায় অঞ্চল বিশেষের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা-সংকট উপস্থাপিত হয়েছে, পরবর্তীকালে ডায়ালেকটিক্যাল মেটারিয়ালিজমে আস্থাশীল হয়ে তিনি লিখেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস।[২৪]

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) রাজনৈতিক উপন্যাস দিয়ে সাহিত্যকাশে আবির্ভূত হলেও সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনায় তাঁর সৃজনশীলতার প্রকাশ লক্ষণীয়। তাঁর *জাগরী* সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। রাজনীতি-সচেতন পরিবারের কাহিনি *জাগরী*। এ উপন্যাসে রাজনীতিসচেতন মানুষের যে সংশয়, দ্বিধা তার মধ্য থেকে সত্যকে তুলে আনতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

---

[২৩] গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[২৪] গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

> জাগরী তাঁর প্রথম উপন্যাস–চারটি চরিত্র। ফাঁসির আগের সন্ধ্যা, বিলুর আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যদিয়ে কাহিনির শুরু বাবা, মা, দুইভাই একটি অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষা করেছে এবং চারজনই সম্পূর্ণ একাকী আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন। জাগরীর লেখক যে শিল্প-আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন তা হলো, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মনোজগৎকে মেলে ধরা, চরিত্রগুলি আত্মমগ্নতায় ভুলে থেকে বাস্তবতাকে প্রকাশ করে।[২৫]

জাগরী উপনাসে লেখক চরিত্র মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মনোজগৎকে মেলে ধরেছেন। এ উপন্যাসে বিলুর স্মৃতিভাষ্যে তার পরিবারসহ পারিপার্শ্বিক চরিত্রেরা উঠে এসেছে। চেতনা-প্রবাহরীতির সার্থক ব্যবহারে এ উপন্যাস সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর সব উপন্যাসেই মানবজীবনের সংকটকে বিষয়বস্তু করেছেন। আমরা দেখি *জাগরী*তে তিনি পারিবারিক সংকটকে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে *ঢোঁড়াই চরিত মানসের* বিষয় ব্যক্তি এবং সামাজিক সংকট। *ঢোঁড়াই চরিত মানস* উপন্যাসে ঢোঁড়াইকে লেখক তাঁর মনোলোকে কল্পিত বাস্তবতার আলোকে সৃষ্টি করেছেন। *ঢোঁড়াই চরিত্র মানস* প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> ঢোঁড়াই চরিত মানস সমাজ সত্যে অন্বিষ্ট ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনের কাহিনি। ঢোঁড়াই চরিত মানস পড়ার পর পাঠকের মনে বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ছবি ভেসে ওঠে। তার থেকেও বেশি মানব বিবর্তনের ইতিহাস উপন্যাসের মধ্যদিয়ে নতুন করে পাঠকের মনে জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।[২৬]

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাশিল্পী। বহুমাত্রিকতা ও দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। নিম্নবর্গের জীবন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার সংগ্রামের পাশাপাশি উপনিবেশিক শাসন-পরবর্তী জনসম্পৃক্ত আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে রচিত তাঁর কথাসাহিত্য। সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা জাতিগোষ্ঠীর একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। প্রথম গ্রন্থ *ঝাঁসির রানী* (১৯৫৬) তাঁর সৃষ্টিশীল অভিরুচির পরিচায়ক। তবে তাঁর উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। তাঁর *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪), *মাস্টার সাব* (১৯৭৯), *বিশ-একুশ* (১৯৮৩), *উনিশ নম্বর ধারার আসামী* (১৯৯৮)–এসব উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন তথা তৎকালীন শ্রেণিচেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ জনতার দাবি আদায়ে সদাসোচ্চার মহাশ্বেতা লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন পরিস্থিতি তুলে এনেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব বিষয়ে সমালোচক লিখেছেন :

> নকশাল আন্দোলন নিয়ে একক কথাশিল্পী হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীই সবচেয়ে বেশি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এ কারণে নকশাল আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস তাঁর উপন্যাসমালায় গ্রথিত হয়ে আছে। সত্তর দশকের নকশাল

---

[২৫] দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী : খুঁজে ফেরা, কালি ও কলম ই-জার্নাল, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২১/www.google.com

[২৬] দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ই-জার্নাল, কালি ও কলম

> আন্দোলনকারীরা ধারালো অস্ত্র-বন্দুক হাতে নিয়েছিলেন, তাদের কথা লিখতে গিয়ে মহাশ্বেতা যে কলম তুলে নিয়েছেন তা আরো সুতীক্ষ্ণ।[২৭]

বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর বিচিত্র ও নিম্নবর্গের মানুষকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে। আদিবাসীদের নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি নিজেই মুণ্ডাসমাজের ঘরের আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। আদিবাসী চরিত্র উপস্থাপনে ভারতীয় প্রান্তিক আদিমজনের জীবন-সংস্কৃতিরই সাক্ষ্যবাহী যা বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ঢাকায় জন্ম নেয়া মহাশ্বেতা দেবীর সর্বশেষ বাসস্থান ছিল কলকাতায়। তাঁর উপন্যাসগুলো কালের দলিল হিসেবে সদর্থকতার পরিচয়বাহী।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে উপন্যাসের যে স্বতন্ত্র কাঠামো তাই বাংলাদেশের উপন্যাস নামে পরিচিত। ক্ষেত্রগুপ্ত লিখেছেন :

> বাংলা উপন্যাসের ইতিকথা রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৭ এরপর থেকে দুটি পৃথক ধারায় বইতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ-পরবর্তীকালে বাংলাদেশ। পূর্বাঞ্চলের রাজনীতি-অর্থনীতি স্বতন্ত্র খাত ধরে চলতে লাগল।[২৮]

১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় যারা আবির্ভূত হয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য–সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু ইসহাক, সরদার জয়েনউদ্দীন, শওকত ওসমান, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, শহীদুল্লা কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ লেখককে নিয়ে আলোচনাসূত্রে তাঁদের রচনারীতির পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠকদের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটবে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যের নিরীক্ষাধর্মী সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সার্থক ব্যবহারে তিনি বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্রধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যঁ পল সার্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনায় চেতনা প্রবাহরীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাঁর *লালসালু* উপন্যাসে তিনি দৃষ্টিকোণের নানামাত্রিক ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন :

> ঘটনাংশ এবং প্রকরণের শৈল্পিক সমন্বয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লালসালু (১৯৪৮) বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের একটি দীপ্তিমান এবং অনতিক্রান্ত শিল্পপ্রতিমা। এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ধর্ম ব্যবসায়ী মজিদের অস্তিত্বের অন্তঃসংকট বহির্মুখী জীবন নয়, বরং মজিদের অভ্যন্তর সংকট-সংশয় এবং নৈঃসঙ্গ্য এ উপন্যাসের মৌল-প্রতিপাদ্য।[২৯]

---

[২৭] শামসুজ্জামান মিলকী, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস : প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১, পৃ. ১৮৬

[২৮] ক্ষেত্রগুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, প্র-খ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, পৃ. ৪৬

[২৯] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১০৭

ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরবর্তী রচনা *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) কিংবা *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী দর্শনের যে রূপায়ণ ঘটেছে তার পূর্বাভাস পাঠক *লালসালু*তেই পেয়েছেন। *চাঁদের অমাবস্যা*তে আরেফ আলীর অস্তিত্ব সংকট ও সংকট থেকে আত্মমুক্তির পর্যায়ক্রমকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক এতে যুক্ত করেছেন মনোবিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি। অন্যদিকে *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে তবারক ভুঁইঞার দৃষ্টিকোণ-আশ্রিত ঘটনাপুঞ্জের মাধ্যমে কুমুরডাঙ্গা গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিপর্যস্ত জনপদের অস্তিত্বভীতি ও মুক্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন উপন্যাসিক। *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খানের মন্তব্য স্মর্তব্য :

> *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের অন্তর্ময় স্বগত কথনরীতির (interior Monologue) অনেকান্ত (multiple) ব্যবহার অনেকাংশে স্যামুয়েল বেকেটের Malone Dies উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। একাধিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, অতীত ও বর্তমানের অন্তর্বয়নের মধ্য দিয়ে ঘটনার অগ্রগতি, চরিত্র-ভূমিকার অবস্থান বদল প্রভৃতি বিচারে *কাঁদো নদী কাঁদো* বেকেটের শিল্পরীতির সন্নিকটবর্তী।[৩০]

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) বাংলাদেশের মননশীল লেখক। পল্লিজীবনের অনুষঙ্গে রচনা করেছেন *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাস। অন্যদিকে *সূর্যদীঘল বাড়ি* উপন্যাসে তিনি গ্রামীণ কুসংস্কার, শোষণ, মহাজনি প্রথাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও সমাজসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে কাহিনি গ্রথিত করে শ্রেষ্ঠত্বের পথে ধাবিত হয়েছেন তিনি। *সূর্যদীঘল বাড়ি* উপন্যাস প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন :

> বিষয়-গৌরবে ব্যতিক্রমী হলেও লেখকের অমীমাংসিত জীবনদৃষ্টি, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-প্রগতির ধারা অনুসন্ধানে মধ্যবিত্তসুলভ ভ্রান্তি ক্ষুণ্ন করেছে *সূর্যদীঘল বাড়ি*-র শিল্পমূল্য। তবু একথা স্বীকার করতেই হয়, আবু ইসহাকের *সূর্যদীঘল বাড়ি* ধর্মজীবীর শোষণে নিষ্পেষিত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে উন্মূলিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম-জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী অসংখ্য জয়নুল-হাসুদের জীবন যাপনের বিশ্বস্ত রূপবন্ধ।[৩১]

সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬) সমাজমনস্ক শিল্পী। তাঁর উপন্যাসসমূহে সমাজ ও সমাজ-অন্তর্গত মানুষের জীবনালেখ্য উপস্থিত করেছেন। তাঁর *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭) উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন সময়ে জনদুর্ভোগের চালচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে সৈয়দ আকরম হোসেন লিখেছেন :

> উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে লেখা। বিস্তৃত ক্যানভাসে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মানুষের নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট, মানুষের জীবনযুদ্ধের বহুভুজ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[৩২]

---

[৩০] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ২১৭

[৩১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

[৩২] সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯৮

চরিত্রবহুল এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মানুষের জীবন যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*, *পান্নামোতি* উপন্যাসসমূহে সমাজ মানসকে ইতিহাসসহযোগে রূপায়িত করেছেন।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাশিল্পী। বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ সচেতনতামূলক কথাসাহিত্য রচনায় তিনি অগ্রগামী। রূপক প্রতীকধর্মী সাহিত্যও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর *ক্রীতদাসের হাসি* রূপক-প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। এ উপন্যাসে উল্লিখিত প্রতিবাদের এই পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাদশাহ হারুন রশীদের রূপকে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের প্রতিকৃতি এঁকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ উপন্যাসের তাতারি সেন বাংলাদেশের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তাঁর *জননী* উপন্যাসে দরিয়াবিবির জীবনযুদ্ধের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসটি প্রতিকূল সমাজবাস্তবতায় নারীর মাতৃস্নেহ এবং এরই বিপ্রতীপে গ্রামীণ জোতদারের লিবিডোতাড়িত বিকৃত বাসনার চিত্র রূপায়ণে সার্থক। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর *জলাঙ্গী*, *দুই সৈনিক*, *জাহান্নাম হইতে বিদায়*, *নেকড়ে অরণ্য* ইতিহাসের সাক্ষ্যবাহী উপন্যাস।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) *কাশবনের কন্যা* দক্ষিণ বাংলায় সমুদ্রের তীরবর্তী মানুষের জীবনগাথা নিয়ে রচিত। জন্মসূত্রে বরিশাল অঞ্চলে বেড়ে ওঠা লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ বরিশাল অঞ্চলের নদীকেন্দ্রিক জীবন-যাপনের আনন্দ-বেদনার কাহিনিকে গ্রথিত করে তাঁর কথাসাহিত্যকে শিল্পসফল করেছেন। তাঁর *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসটি মূলত বেদে জীবনের আখ্যান। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবন-ঘেঁষা পটভূমিতে লিখেছেন *জায়মঙ্গল* উপন্যাস। এই উপন্যাসে সুন্দরবনের হিংস্র পশুদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে দীপ্ত মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তাঁর রচিত *কাঞ্চন গ্রাম* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী রচনা।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) বিরলপ্রজ সাহিত্যিক। স্বল্প কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কালজয়ী উপন্যাসের স্রষ্টা তিনি। তাঁর রচিত উপন্যাসে মানব চরিত্রের মানবিকতা ও অপরাজিত মানবসত্তারই যেন জাগরণ ঘটেছে। তাঁর রচিত *সারেং বৌ* উপন্যাসে নবীতুনের জীবন ও কদম সারেং-এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। এ উপন্যাসে তিনি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগ্রাম ও পরিণামকে রূপকের আড়ালে উপস্থাপন করেছেন। *সংশপ্তক* তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সময়ব্যাপী ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, বহুমাত্রিক লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সব্যসাচী লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ কথাশিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর জীবন

সৃষ্টির গভীরতা, সমাজচেতনা, সততা, শ্রেণি-সচেতনতা, নিম্নবর্গের প্রতি দরদ, শোষিত-পীড়িত মানুষের কষ্ট, মাটি ও ফসলের ঘ্রাণ, নিরাসক্তিশূন্য জীবনচেতনা তাঁর শিল্পীসত্তার মূলে গ্রথিত। তাঁর উপন্যাস ও গল্প বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। তাঁর ষাটের দশকের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন সূত্রে চরিত্রের মনোজাগতিক অন্তর্বাস্তবতা নির্মাণে ছিলেন সচেষ্ট। তিনি প্রেম ও মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস ও গল্প রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। উপন্যাস ও গল্পে নরনারীর মনস্তত্ত্বের বিচিত্ররূপ তাঁর আরাধ্য। তাঁর *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, জ্যোৎস্নার অজানা জীবন, অনূদিত অন্ধকার, অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* প্রভৃতি উপন্যাসে মানব মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের যে নিবিড় যোগসূত্র, তা উন্মোচনে সচেষ্ট থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতি অনুসরণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটগল্প সাহিত্যের সবচেয়ে নতুনতর শাখা। উপন্যাসের চক্রপ্রবাহের মধ্যে জীবনের অখণ্ড চিত্র রূপায়িত হয় এবং অঢেল সময়ের বিনিময়ে পঠন-পাঠন অব্যাহত থাকে। সভ্যতার বিকাশে যন্ত্রনির্ভর শিল্পের প্রাবল্য, অভিজাততন্ত্রের পতন এবং জীবনের নতুন উপলব্ধিতে মানুষের কর্ম যখন মুখরহীন সে সময়ে ব্যক্তিক জীবনের পর্যবেক্ষণে ছোট কলেবরে জীবনের সমগ্রতাকে অঙ্কনের অভিপ্রায়ে সৃষ্টি হয়েছে ছোটগল্প। সুপ্রাচীনকাল থেকে গল্প বলা ও শোনার প্রতি পাঠকের আগ্রহ থাকলেও একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্য দিয়ে ছোটগল্প শিল্পসত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। উদ্ভব পর্যায়ে এডগার এলান পো (১৮০৯-১৮৪৯) ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ তথা কাঠামো নির্দিষ্ট করে ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হন। সমকালীন বিশ্বসাহিত্যে গল্প রচয়িতা হিসেবে নাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-১৮৬৪) এবং রাশিয়ার নিকোলাই গোগল (১৮০৯-১৮৫২) গল্পের ভুবনে আবির্ভূত হন। গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) তিন শতাধিক গল্পের রচয়িতা। তিনি বিশ্বসাহিত্যে গল্পের বিকাশে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। ছোটগল্পের চারণভূমি ফ্রান্সের স্তাঁদলে (১৭৭৬-১৮৪২), বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) প্রমুখের মাধ্যমে ছোটগল্প পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক কাঠামো হিসেবে স্থান পেল। এছাড়াও আন্তন চেখভ (১৮৬০-১৯০৪), হোর্হে লুই বোর্হেস (১৮৯৯-১৮৯৬) প্রমুখ লেখকের গল্পে মানব মনস্তত্ত্ব প্রেম, যান্ত্রিক জীবনের সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে।

ইতালির রেনেসাঁ আন্দোলন থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সমাজবাদী রাশিয়ার বিপ্লব (১৯১৭)সহ অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক প্রসার, দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ, সভ্যতা ও মানুষের মনের ওপর, চিন্তাজগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সামন্ত সমাজে অবজ্ঞার শিকার ব্যক্তি শিল্পীর কল্পিত উপাখ্যানে ছোটগল্পে স্থান পেলেন সস্নেহে। পরিবর্তনশীল জীবনের চালচিত্র উঠে আসে ছোটগল্পে।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষাযাপন' কবিতার মধ্যে বলে দিয়েছেন :

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘটঘটা
নাহি তত্ত্ব; নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত ছোটগল্পের সংজ্ঞা যথেষ্ট হলেও অনেক সাহিত্যিক-সমালোচক ছোটগল্পের স্বরূপ তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। ছোটগল্পের গঠন ও এর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মন্তব্য স্মর্তব্য :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় :

> ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একমাত্র বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।[৩৪]

উইলিয়াম হাডসন :

> The story is not in the bast likely to displace of novel for the very good reason that it can not meets the novel or novels own ground, or do precisely what the novel does.[৩৫]

ভূদেব চৌধুরী :

> একটি জীবনকে অনন্ত জটিলতার মধ্যে পরিকীর্ণ করে শাশ্বত জীবনের মূর্তি রচনা করে উপন্যাস। আর অনন্তে প্রসূত জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের অতলে একান্ত করে বিম্বিত, সীমাব্যঞ্জিত করে ছোটগল্প।[৩৬]

উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং আঙ্গিক প্রকরণে উভয়েই পৃথক সত্তার। আকারে ও প্রকারে ছোটগল্পে যেখানে থাকে একটি বিষয়ের অভিব্যক্তি, সেখানে উপন্যাসে থাকে বহুতর বিষয়ের পল্লবিত বিন্যাস। ছোটগল্পের মধ্যে অখণ্ড জীবনায়ন সম্ভব নয় বলে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র রূপায়ণ দুরূহ। এখানে চরিত্রের বিশেষ প্রবণতা চিত্রিত করা সম্ভব। কিন্তু উপন্যাসে অখণ্ড জীবনবিন্যাসে চরিত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ

---

[৩৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২০৯

[৩৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২০৮

[৩৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ৩০৯

[৩৬] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৩৫

বিক্ষিপ্ত হতে পারে। ছোটগল্পের প্লট একটি কিন্তু উপন্যাসের একটি প্লটের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে কিছু সাব প্লট বা উপকাহিনি। রবার্ট লুই স্টিভেনসন বলেছেন :

> There are so far as I know, there ways, and three ways of writing a story. You may take a plot and fit character to it, or you may take a character and choose incidents and situation to develop it or lastly you may take a certain atmosphere and get action and person to realize it.[৩৭]

বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু গদ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রে। উনিশ শতকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রে কিছু পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল যেগুলো ছিল আখ্যানমূলক। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কথামালা ও আখ্যান মঞ্জরী জাতীয় ছাত্রপাঠ্য গল্পকাহিনি রচনা করেন। তবে এগুলো মৌলিক ছিল না। এগুলো ছোটগল্পও নয়। তৎকালীন কোলকাতায় যে নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে গল্পের উপাদান ছিল বহু। বাঙালি জীবন গল্পবস্তুতে ভরপুর থাকলেও বাঙালি লেখকেরা ছোটগল্পের শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূত্রপাত করেন। ইতিহাস বিচারে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আগেও পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ, তাঁর গল্প 'মধুমতী' গল্পকে প্রথম ছোটগল্পরূপে ধরা হয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় হলেও তাঁর গল্প সংকলন 'ওমর চরিত' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্পের পরে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের রীতিনীতি বুঝে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে তাঁর গল্প প্রকাশ পেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম শিলাইদহ-শাহজাদপুরে ছিলেন তখন অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্পে বাংলার গ্রামীণ জীবনের ছবি ও প্রকৃতিচিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পরে নাগরিক জীবন নিয়ে তিনি সুন্দর সুন্দর গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে নরনারীর সম্পর্ক এবং সমাজের নানা সমস্যার পরিচয় আছে। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ একশটির মতো গল্প লিখেছেন যা 'গল্পগুচ্ছ' নামে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গল্পকে বিশ্বজনীনতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প নতুন আঙ্গিকে পাঠক-হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা গল্পের বিষয়বস্তু ও রূপরীতির পরিবর্তন আসে। ভালো ভালো ছোটগল্প-শিল্পীর জন্ম হয় বাংলা সাহিত্যে। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু,

---

[৩৭] Graham Balfour, 'Life of Stevenson', উদ্ধৃত, অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, সূচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ. ২০

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মিল কর প্রমুখ লেখকের গল্পে প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন, সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপট, মানব মনস্তত্ত্ব, নর-নারীর প্রেম, মানবিকতার চিত্র অঙ্কনে তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর বাংলাদেশের সাহিত্য নামে পরিচিতি পায় পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যধারা। দেশবিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশে ঢাকা সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় ছোটগল্প নতুন পথে যাত্রা করে দেশ-বিভাগ-উত্তর বাংলাদেশে। বাংলাদেশের সাহিত্য ধারায় ছোটগল্প রচনায় যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) বিশ শতকের বিশের দশক থেকে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর রাজনীতির অভিজ্ঞতা সমাজ-বিশ্লেষণের আলোকে সাহিত্য রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর রচিত গল্পগুলোতে তিনি সমাজের ত্রুটিকে ব্যঙ্গ করে সংশোধনের পথ নির্দেশ করেছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির চিত্র উপস্থাপন করে ধর্মান্ধদের কটাক্ষ করেছেন। তাঁর সাহিত্য-চিন্তা প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> মুক্ত বুদ্ধি ও সুস্থ চেতনার সঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের মানসিকতার ছিল একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষের প্রতি মমতার কারণেই তিনি মানুষকে এক পরিচ্ছন্ন সমাজের অধিবাসীরূপে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, সুতরাং মানব-সমাজের কুৎসিত দিকগুলো তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।[৩৮]

ছোটগল্পে কাহিনির চেয়ে ঘটনার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ। প্রধানত স্যাটায়ারের মাধ্যমে সমাজ শোধনের চেষ্টা করে গেছেন তিনি। আয়না (১৯৩৫) ও ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪) এ দুটি গ্রন্থই ব্যঙ্গরচনা। এছাড়া আসমানি পর্দা ও ফুড কনফারেন্সও একই প্রকারের ব্যঙ্গ ছোটগল্প। কাজী নজরুল ইসলাম আয়নার গল্প প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

> যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা দিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোশ-পরা এই বহুরূপী বন-মানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিক্সের আখড়ায়, সাহিত্য-সমাজে যেন বহুবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।[৩৯]

---

[৩৮] আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪৬

[৩৯] প্রাগুক্ত, আজহার ইসলাম, পৃ. ৪৭

আয়নায় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির বিষয়গুলো বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আবুল মনসুর আহমদের অধিকাংশ গল্প তাঁর বিশেষ দৃষ্টিকোণের আলোকে রচিত। ফলে তাঁর গল্পের নাম দেখলেই অনেক ক্ষেত্রে বিষয়গত ও ভাবগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে পাঠকের পূর্বধারণা জন্মে। আবুল মনসুর আহমদের গল্প প্রসঙ্গে সমালোচকদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

বিশ্বজিৎ ঘোষ :

> সাবলীল ভাষা, চরিত্রানুগ সংলাপ এবং সরল প্লট আবুল মনসুর আহমদের গল্পের জনপ্রিয়তার মূল কারণ।[৪০]

রাজীব হুমায়ুন :

> ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক গল্প রচনায় আবুল মনসুর আহমদের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সমাজের নানা দোষ-ত্রুটি ও অসঙ্গতি তিনি ব্যঙ্গের আবরণে উন্মোচন করেন। ভণ্ডধার্মিক, অসৎ রাজনীতিবিদ এবং কপট সমাজসেবকের বহুমাত্রিক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি আবুল মনসুর আহমদের ছোটগল্পে।[৪১]

আবুল মনসুর আহমদের রাজনীতির অভিজ্ঞতা সাহিত্যে সমাজ বিশ্লেষণে সহায়তা করেছিল তা সত্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা-সংকটকে ব্যঙ্গ করে সমাজ শোধনে ব্রতী ছিলেন তিনি।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)-এর বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে প্রাক-সাতচল্লিশ পর্বেই। যুদ্ধ-উত্তর বিপর্যয়, কল্লোলীয় প্রভাবে, মনোবিশ্লেষণধর্মিতার জাগরণ এবং মুসলিম সমাজের প্রতি প্রচণ্ড দরদে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের জগৎ। তাঁর গল্প প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি'র সাহিত্যধারায় যে মননঋদ্ধ নাগরিক চেতনার উদ্বোধন, মুসলিম কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আবুল ফজলের রচনাতেই তাঁর প্রথম উদ্ভাসন। প্রগতিশীল সমাজচেতনা, মুসলিম মধ্যবিত্তের রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা এবং অসাম্প্রদায়িক জীবন-চেতনা আবুল ফজলের শিল্পীমানসের মৌলবৈশিষ্ট্য এবং স্বাভাবিকভাবেই এসব প্রবণতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে। মনোগহনের জটিলতা উন্মোচনে আবুল ফজল উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।[৪২]

আবুল ফজলের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কল্লোল পত্রিকার 'একটি আরবী গল্প' নামে। ১৯২৬-এ ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ঘিরে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ছিলেন 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত। 'মাটির পৃথিবী' (১৩৪৭), 'আয়ষা' (১৩৫৮), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৭১),

---

৪০ বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ১৭১

৪১ রাজীব হুমায়ুন, *আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ রচনা*, ১৯৮৫, ঢাকা, পৃ. ১২-১৯

৪২ বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

'স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন' (১৯৭৮), 'মৃতের আত্মহত্যা' (১৯৭৮), 'রাহু' আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠতম গল্প। এছাড়া 'সতীর সহমরণ', 'কুমারী এ-মা', 'বিবর্তন', প্রভৃতি গল্পে আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ তৈরি করেছেন। 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' গল্পে কাহিনি ও চরিত্রের চেয়ে আদর্শকেই জয়যুক্ত করেছেন গল্পকার তাঁর ছোটগল্পে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮) বিভাগপূর্বকালেই গল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। তিনি পল্লিজীবনকে উপজীব্য করে অধিকাংশ গল্প রচনা করেছেন। তাঁর গল্পে সমাজচেতনা, সংস্কারমুক্ত জীবন প্রত্যয় ও উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রথমদিকের গল্পগুলো গ্রামীণ জীবন-নির্ভর করে রচিত হয়েছে। তাঁর 'জীবন', 'শেষ রাত্রির তারা' প্রভৃতি গল্পে পল্লিবাংলার জীবন ও প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। শেষের দিকের গল্পগুলোতে তিনি নাগরিক মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের চালচিত্র উপস্থাপন করেছেন ঠিকই কিন্তু কখনোই নির্বাসিত হয়নি পল্লিজীবন। তাঁর গল্পগ্রন্থ পাঁচটি। তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পের বই 'জীবন'। আজকের সময়ে চারদিকে নগরায়ণের যে ছাপ তাতে আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রাসঙ্গিক।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে যখন আত্মপ্রকাশ করেন সে সময় শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তিনি সদর্পে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবিতা দিয়ে শুরু হলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি সমাদৃত। দেশবিভাগের আগেই গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হলেও শওকত ওসমানের প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় আবহ তাঁর গল্পে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। প্রথম দিকের গল্পগুলোতে নিম্নবর্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত জীবনালেখ্য অঙ্কনে সচেষ্ট ছিলেন লেখক। প্রান্তিক মানুষ, মধ্যবিত্ত, মুক্তিযুদ্ধ এসব বিষয় উপস্থাপন করেছেন উপন্যাস, ছোটগল্পে। 'পিঁজরাপোল', 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' এবং 'তিন মির্জা', 'পুরাতন খঞ্জর', 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' তাঁর গল্পগ্রন্থ। শওকত ওসমানের ছোটগল্প প্রসঙ্গে সমালোচক আজহার ইসলাম লিখেছেন :

> বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় শওকত ওসমান একজন বড়ো মাপের শিল্পী। তাঁর শব্দপ্রয়োগগত বিশিষ্টতা ও বাক্যবিন্যাস নিঃসন্দেহে উঁচুমানের; বিষয়ের পরিবেশনা যেমন উজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত, তার নাটকীয়তা তেমনই মৃদু মধুর; সংলাপ-সৃষ্টিতে বুদ্ধির চাতুর্য লক্ষযোগ্য এবং শিল্পময় ভাবনার ত্বরিত উদ্ভাবনা ও তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ-কৌশল তাঁর ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত বিজয়।[৪৩]

[৪৩] আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) কথাসাহিত্যের মনস্তত্ত্বের জটিল জিজ্ঞাসার অভিমুখী কথাশিল্পধারার অন্যতম পথিকৃৎ। অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার জটিল অন্তর্বাস্তবতা পাশ্চাত্য শিল্পরীতি প্রযুক্ত করে তাঁর ছোটগল্পকে কালোত্তীর্ণ সত্তায় উত্তীর্ণ করেছেন। তাঁর 'নয়ন চারা', 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' তাঁর প্রধান গল্প। এছাড়াও 'জাহাজ', 'পরাজয়', 'মৃত্যুযাত্রা', 'খুনী', 'রক্ত', 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়', 'সেই পৃথিবী' গল্পগুলোতে মানুষের অন্তর্বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে দারিদ্র্যপীড়িত সময়ের চিত্র অঙ্কনের পরিচয় দিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্। ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্প প্রসঙ্গে সৈয়দ আকরম হোসেনকে উদ্ধৃত করে বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন :

> "যুদ্ধোত্তর বিনাশী প্রতিবেশে বাস করেও মানবীয় অস্তিত্বের ক্লান্তহীন সাধনায় তিনি ছিলেন স্থিতপ্রাজ্ঞ। নিরস্তিত্বের শূন্যতায় ফুরিয়ে যাওয়া জীবন নয়, অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অস্তিত্বের দায়িত্বশীল স্বাধীন সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁর ছোটগল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য। গল্পের বিষয় নির্বাচনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন বাংলাদেশের জনজীবনসম্পৃক্ত, কিন্তু বক্তব্য ও প্রকরণে সর্বজনীন, বিশ্বপ্রসারিত, ঘনিষ্ঠ এবং পরীক্ষাপ্রিয়। চেতনা ও আঙ্গিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পসমূহ যেন তাঁর পরিব্যাপ্যমান জীবনবোধের অনুবিশ্ব। মানুষের অস্তিত্ব-অভীপ্সা, নৈঃসঙ্গ্য, ভয়-অনুশোচনা প্রভৃতি তাঁর গল্পের উপজীব্য।[৪৪]

পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পের যে স্বতন্ত্র ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল সরদার জয়েনউদদীন (১৯১৮-১৯৮৬) তার মধ্যে অন্যতম। তাঁর গল্পে গ্রামীণ জীবন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের বলয়বৃত্তে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর গল্পে জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়, মানুষের সুখ-দুঃখকে আপন করে নিয়ে ছোটগল্পের আপন বলয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন। তাঁর গল্পে প্রতিফলিত জীবন নিয়ে সমালোচক লিখেছেন :

> সরদার জয়েন উদ্‌দীনের প্রথম দিকের গল্পগুলোর পটভূমি প্রধানত বাংলাদেশের গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজজীবন। তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীরা সবাই অনাহার অর্ধাহারে জীবনযাপন করে। এরা সমাজ-নির্যাতনের সাক্ষী, উচ্চবিত্তের দর্পিত অহংকারের শিকার। এদের দুঃখ-দুর্দশা ও গ্লানিভরা জীবনের কাহিনী লেখকের শিল্পীমানস আন্দোলিত করে। এদের কাহিনী গড়ে তোলেন লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে।[৪৫]

সরদার জয়েনউদদীনের গল্পগুলো বাস্তবানুগ চিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক শিল্পসাহিত্যের কলাকৌশল তাঁর ছোটগল্পে খুব বেশি প্রযুক্ত না হলেও অভিজ্ঞতার আলোকে কথাশিল্পীর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তার গল্পে লক্ষণীয়। 'নয়ানচুলী'র গল্পগুলো সমাজবাস্তবতায় নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদ। তৎকালীন পাবনা অঞ্চলের যাপিত জীবনের চালচিত্র উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন গল্পকার 'করালী, 'ভাবী',

---

৪৪ বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৪৫ প্রাগুক্ত, আজহার ইসলাম, পৃ. ১৪০

'কানা ফকিরের ব্যাটা', 'ফুলজান', 'কাজী মাস্টার', 'সবজান', 'নয়ানঢুলী' এসব গল্প *নয়ানঢুলী* গ্রন্থের আওতাভুক্ত। এছাড়া *বীরকণ্ঠীর বিয়ে* গ্রন্থেও নারী চরিত্রের প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কোয়েলা', 'কুলটা', 'বয়াতী', 'ইজ্জত', 'বাতাসী', 'গোলাপীর সংসার' এসব গল্প তার প্রমাণ।

আবু রুশদ (১৯১৯-২০০৮) তাঁর গল্পে মুসলিম মধ্যবিত্তের সংস্কার চেতনা ও প্রবঞ্চনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দেশবিভাগের পূর্ববর্তী সামাজিক সংকট, মানব জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অন্তঃসারশূন্যতাকে গল্পের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। তাঁর পরবর্তীকালের গ্রন্থে জীবনকে রোমান্টিসিজমের দৃষ্টিতে দেখলেও জীবনটা যে রোমান্টিক নয় মূলত এই বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছেন ছোটগল্প। তাঁর গল্প প্রসঙ্গে আজহার ইসলাম লিখেছেন :

> শিল্প-বিচারে তাঁর গল্পগুলো খুব উন্নতমানের, এমন মনে করার কারণ নেই। আবু রুশদ গল্পের বহিরাঙ্গের প্রতি যতখানি মনোযোগ দিয়েছেন, ভিতরের দিকটির প্রতি তেমন দিতে পারেননি। সেজন্য তাঁর গল্পে চিত্রচরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণের গভীরতা কম। মানুষের মনের বিষয়কে তিনি তাঁর গল্পের প্রয়োজনে উপস্থাপিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু একটি ব্যথাদীর্ণ মনের অন্তর্বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানীর মতো তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপের যে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আবশ্যক, সেই বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে বিষয়ের বহিরঙ্গ চিত্রায়ণে তাঁর যতখানি কৃতিত্ব, বিষয়ের অভ্যন্তরীণ বর্ণনায় ততখানি নয়।[৪৬]

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)-এর কথাসাহিত্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের প্রধানত নিম্নবর্গের জীবন সংগ্রাম ও তাদের বেঁচে থাকার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। 'পথ জানা নেই' (১৯৪৮), 'অনেক দিনের আশা' (১৯৪৯), 'ঢেউ' (১৯৫৩), 'দুই হৃদয়ের তীর' (১৯৫৫), 'জীবন কাব্য' (১৩৬৩), 'পুঁই ডালিমের কাব্য' (১৩৯৪), তাঁর এসব গ্রন্থের ছোটগল্পগুলোর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের কথা ব্যক্ত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা 'রক্তের স্বাদ' গল্পটি তাঁর অন্যতম সৃষ্টি। তাঁর অধিকাংশ গল্পে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) বাংলা সাহিত্যে একজন দক্ষ পল্লিসমাজ ও জীবনের রূপকার। তাঁর গল্পে গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা, সংগ্রামের কাহিনি উঠে এসেছে। তিনি প্রধানত শোষিত মানবাত্মার আর্তনাদে বেশি সাড়া দিয়েছেন। তাঁর 'জোঁক' গল্পে শ্রেণিসংগ্রামের শিল্পভাষ্য হিসেবে আবু ইসহাকের জীবনবোধের পরিচয়বাহক। 'হারেম', 'মহাপতঙ্গ' তাঁর গল্পগ্রন্থ। তাঁর প্রথম গল্প 'অভিশাপ' ১৯৪০ সালে নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

---

[৪৬] প্রাগুক্ত, আজহার ইসলাম, পৃ. ১৫১

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) পঞ্চাশের দশকের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। যদিও প্রথম লেখা বেরিয়েছিল দেশভাগের আগেই। দেশভাগ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ১৯৫০-এ জেগে আছি গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর উপস্থিতি ঘোষিত হয়েছে। বিচিত্র পরিসরে গল্প লিখেছেন আজাদ। দেশভাগ, রাজনীতি, প্রেম ও মনস্তত্ত্ব এবং সমাজজীবনকে উপজীব্য করে গল্প লিখেছেন তিনি। আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন :

> প্রথম পর্বের গল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদের দেশ-কাল-শ্রেণি সচেতন মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। *জেগে আছি* (১৯৫০), *ধানকন্যা* (১৯৫১), *মৃগনাভি* (১৯৫৩) প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রেণিসচেতনতায় সজাগ থেকে তিনি নির্মাণ করেছেন মানবতার অপরাজেয় গৌরবগাথা। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের গল্পে মার্কসীয় শ্রেণি ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি জীবনের অন্তঃঅসঙ্গতি সন্ধানে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও যৌন ধারণায় আকৃষ্ট হলেন। জীবন দৃষ্টির এই পশ্চাৎ গতি তাঁর গল্পের শিল্পসিদ্ধিকেও করেছে ক্ষুণ্ন। মনোবিকলন ও মনোগহনের শিল্পরূপ হিসেবে তাঁর *অন্ধকার সিঁড়ি* (১৯৫৮), *উজান তরঙ্গে* (১৯৫৯), *যখন সৈকত* (১৯৬৭), *জীবন জমিন* প্রভৃতি আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পে সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা-ব্যবহারে সচেতন শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন।[৪৭]

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মৌল পরিবর্তন ঘটে। চেতনার গুণগত বিকাশ ঘটে।

> স্বাধীনতার সোনালি প্রভায় আমাদের মন আর মননের যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে ছোটগল্পে তার প্রতিফলন ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ছোটগাল্পিক যুদ্ধোত্তর হতাশা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শব্দচিত্র অঙ্কনেই হলেন অধিক আগ্রহী; দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদে উচ্চকিত হওয়ার পরিবর্তে অনেকেই যেতে চাইলেন নির্বেদ-নিরানন্দের অতল গহ্বরে এবং সবাই মিলে সম্মিলিত সাধনায় লিখলেন মাত্র একটি ছোটগল্প, যার মৌল বিষয় নাস্তি-নিখিল নাস্তি।[৪৮]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের সাহিত্যে যাঁরা আবির্ভূত হন, তাঁরা হচ্ছেন–মালিহা খাতুন, হেলেনা খান, কাজী ফজলুর রহমান, আবুবকর সিদ্দিক, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, রাবেয়া খাতুন, রাবেয়া সিরাজ, খালেদা সালাউদ্দিন, মকবুলা মনজুর, আল মাহমুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী, নাজমা জেসমিন চৌধুরী, জুবাইদা গুলশান আরা, নয়ন রহমান, আমজাদ হোসেন, আবু কায়সার, হুমায়ূন আহমদ, আবুল হাসান, শহিদুর রহমান, জুলফিকার মতিন, আরেফিন বাদল, বুলবুল চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, আফসান চৌধুরী, ইমদাদুল হক মিলন, শহিদুল জহির প্রমুখ।

---

৪৭ বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৪৮ বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩২১-৩২২

বাংলাদেশের ছোটগল্পের পটভূমি রচিত হয়েছিল ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ-পরবর্তী সময়কালে। পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্পকারদের গল্পে দেশবিভাগ, দুর্ভিক্ষ বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ষাটের দশকের শিক্ষা আন্দোলন, ছয়দফা, গণ-অভ্যুত্থানসহ অন্যান্য বিষয়কে উপজীব্য করে লিখেছেন। সত্তরের দশকে মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধে বলীয়ান হয়ে ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ, প্রতিরোধ, পাকবাহিনীর নির্যাতন বিষয় হিসেবে ফুটে উঠেছে। আশির দশকে স্বৈরাচারী আন্দোলনের কথা বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা ছাড়াও বিশ্বসাহিত্য, বিজ্ঞানমনস্কতা, দর্শন গল্পকারদের মনোজগৎ শাসন করেছে। ফলে বিবর্তনবাদ, অস্তিত্ববাদ, ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা, মনোজাগতিক সংকটও দেশীয় ঘটনার সমান্তরালে ছোটগল্পে বিষয়বস্তু হিসেবে ফুটে উঠেছে।

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের পরিপ্রেক্ষিত

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের পরিপ্রেক্ষিত

প্রথম পরিচ্ছেদ : আলাউদ্দিন আল আজাদের মানস গঠন

আলাউদ্দিন আল আজাদ বর্তমান নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩২ সালের ৬ই মে, বাংলা ২২শে বৈশাখ ১৩৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গাজী আবদুস সোবহান, মাতা মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন। চার কন্যার পর এক পুত্র জন্ম নিল তাদের সংসারে। পরম স্নেহে আর মমত্ববোধে মা শিশুপুত্রের নাম রাখলেন বাদশাহ। মায়ের পরম স্নেহে বেড়ে উঠতে লাগল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী ছায়া-সুনিবিড় মায়াময় সবুজ শ্যামলিমায় উজ্জ্বল জন্মস্থান রামনগর গ্রামে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা :

> আমার জন্মস্থান রামনগর, বৃহত্তম ঢাকা বর্তমান নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। তার সামনে দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে অদূরে ভৈরববাজারের কাছে মেঘনায় পড়েছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। ছোটবেলায় মনে হতো এই গাঙে ডিঙি বেয়ে চলতে থাকলে অনেক বাঁক ও আঁকাবাঁকা শেষে মানস সরোবরে পৌঁছাবো। শ্রেণিকক্ষে পণ্ডিত সাহেব যে বলতেন ওখান থেকেই তার উৎপত্তি।[১]

আলাউদ্দিন আল আজাদ মাত্র আঠারো মাস বয়সে মাতৃহারা হন এবং দশ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান, পিতৃ-মাতৃহারা এতিম বালক বাদশাহ আশ্রয় নেন দাদির কাছে। যিনি প্রত্যহ তাঁকে গল্প শোনাতেন। সেখান থেকেই তিনি গল্পলেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের, হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারী। তিনি খেলার সঙ্গীদের চেয়ে প্রকৃতিকেই বেশি ভালোবাসতেন। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> একটা অনাথ ছেলে হিসেবে আসলেই আমি ছিলাম দাদির 'কানাচোখের পানি' এবং বোনদের 'নয়নের মণি'। ওদের আদর যত্নের কমতি ছিলো না; তবু নিঃসঙ্গবোধ করতাম। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলা হৈ চৈ ভালো লাগত না। বরং পছন্দ করতাম পশুপক্ষী পতঙ্গ জীব। একলা থাকতাম, একলা একলা হাঁটতাম। মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়াচুল, কিন্তু মাথার ভিতরটায় নানা ভাবনার উথালপাতাল। বনজঙ্গল, শস্যমাঠ, বিশেষত নদীর পাড় মূল বিচরণস্থান। নিয়মিত বসার জায়গা ছিল তিনটা : এক. আমাদের বড় থাকার ঘরটার বারান্দার উত্তরপাশে বেড়ায় তৈরি একটি ছোট্ট কামরা, দুই. বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ে আমাদের কাঁচামিঠা আমগাছটার নিচে উঁচু মাটিতে ঘাসে ছাওয়া একটি ধ্যানের আসন এবং তিন. ব্রহ্মপুত্র ব্রীজের গার্ডারের তলায় একটা পিলারের একটু

[১] *আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন সাহিত্য*, সম্পাদনা : সিকদার আবুল বাশার, বাতায়ন প্রকাশন, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৪৫

জায়গা, যেখানে থেকে গৌরীপুরের কাছে নদ-নদীর সঙ্গমস্থল এবং আশ্বিন মাসে ধান কাটতে যাওয়া শতশত পালের নৌকা দেখা যেত।[২]

মূলত লেখার উৎস অনুসন্ধানে এ সমস্ত জায়গায় যেতেন বলে অনুমান করা যায়। এভাবেই শিশু আজাদ বেড়ে ওঠেন মৃত্তিকারই স্পর্শে। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। অনাথ আজাদ পরম দারিদ্র্যের মধ্যেও পড়াশোনাকে জীবনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। তাঁর সময়কালে বিদ্যালয় খুব একটা কাছে ছিল না, ফলে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে হতো :

বর্ষাকালে কচুরীপানার স্তূপের উপরে বইখাতাপত্র রেখে, সেটা ঠেলে নিয়ে নদী সাঁতরে ওপারে উঠে চার মাইল দূরের বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস করতেন।[৩]

এভাবেই শুরু হয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন। স্কুল জীবনেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ছাত্র-শিক্ষক মহলে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু করেন রামনগর জুনিয়র মাদ্রাসায় ১৯৩৭ সালে। এরপর ১৯৪৩ সালে ভর্তি হন নারায়ণপুর শরাফতউল্লাহ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত হয়। এ বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৪৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। স্বপ্ন ছিল ভালো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করার। এ উদ্দেশ্যে তিনি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সংকটের কারণে বিজ্ঞান বিভাগে পড়া হয়নি। তিনি আর্টস বিভাগে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলেন, এ পর্যায়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন নিজের লেখায় :

"উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রবল স্বপ্ন ছিল। প্রবেশিকার দরোজা পার হলাম। প্রথম বিভাগে। আমার দেড় বছর বয়সে মা ইন্তেকাল করেছিলেন এবং দশ বছর বয়সে বাবা : জমিজমা আত্মীয়েরা দখল করলেন। এবং আরও নানা ঘটনায় বুঝেছিলাম গ্রামে আর এগুতে পারবো না। নিঃশব্দে তৈরি হয়ে যাই। কেউ কেউ জেনে ফেললেন এবং মূল্যবান উপদেশও দিতে লাগলেন। বাড়িতে থেকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভৈরব কলেজে লেখাপড়া করাই হবে উত্তম। সকলের কথা শুনতাম, কিছুই বলতাম না। একদিন সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দৌলতকান্দি রেলওয়ে ইস্টিশনে চলে আসি, হাতে একটি গোলাপ-আঁকা টিনের মাঝারি আকারের স্যুটকেস ছিল। তার মধ্যে কিছু কাপড়চোপড় ও বইপত্র। এবং পকেটে পঞ্চাশ টাকা। আমাদের দুইকানি পাটজমি বর্গা দিয়ে একজন সহানুভূতিসম্পন্ন গৃহস্থের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম।[৪]

---

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

আলাউদ্দিন আল আজাদের সংগ্রামশীল জীবনের বর্ণনা করেছেন তিনি নিজেই। পিতৃ-মাতৃবিয়োগের পরে তাঁকে যে নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে তাঁর আত্মজৈবনিক রচনায়। তাঁর সাহিত্যপ্রীতির সূচনা হয়েছে শৈশবে। গ্রামের এক অগ্রজের কাছ থেকে বঙ্কিমের বই পেয়ে আনন্দিত হয়েছেন তিনি তার বর্ণনাও করেছেন। ঋদ্ধ ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পাঠ করা যে শৈশবে সহজপাঠ্য ছিল না সে কথাও লিখেছেন। এরপর তিনি রেলওয়ে থানার ওসির বাসায় গৃহশিক্ষক হিসেবে লজিং পেয়ে গেলেন, পৌঁছানোর পর দিন তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হয়ে যান, সে কথাও বলেছেন। তিনি তাঁর নিজের লেখা বইয়ের প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে আশৈশব বেড়ে ওঠা মানস গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন :

> কেউ যদি বলেন আধুনিক গাইতে গিয়ে খেয়ালের আলাপ কেন, তালতলা দিয়ে হাঁটুন–তাহলে আমি নিরুপায়। কারণ পটভূমির চিত্র বাদ দিয়ে আমি মোনালিসা আঁকতে পারবো না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকলে পড়ে ঢাকা কলেজ তখন ফুলবাড়িয়া ইস্টিশনের পিছনে রাজিয়া মঞ্জিল ও মহল্লার কয়েকটি দালানকোঠায় আশ্রয় নিয়েছিল। আমার থাকার জায়গা যেখানে হল, সেই ছোট দালানটার চৌকোণো খুপড়ি জানালা জালের মধ্য দিয়ে তাকালে মূল বিদ্যায়তনটা দেখতে পেতাম।[৫]

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ১৯৪৯ সালে আজাদ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময় থেকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৪৭-৪৯ পর্বে তিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ বার্ষিকীর সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যয়নকালীন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের জি এস ছিলেন। সম্পাদনা করেছেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের বার্ষিক সাহিত্য সাময়িকী। তিনি সেখান থেকে ১৯৫৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে এমএ পরীক্ষাতেও নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন আজাদ। এখানে উল্লেখ্য, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সে বছর কারাবন্দি শহিদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। শিক্ষাজীবনের ধারাবাহিকতায় উচ্চতর গবেষণা সম্পন্ন করে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ সালে। তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল–'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন ও কবিতা (A Study of life and Short poems of Iswarchandra Gupta)।' এরপর তিনি ১৯৮৩ সালে অরগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এভাবে আলাউদ্দিন আল আজাদ সাফল্যগাথা শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন

---

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

শেষে তিনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯৫৫তে নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৬তে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনায় যুক্ত হন এবং ১৯৬১ অব্দি অধ্যাপনা করেন। ১৯৬২তে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সিলেটে এম.সি. কলেজে বাংলা বিভাগে নিযুক্ত হন। ১৯৬৪-৬৭ চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা করেন। দেশে ও বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা তাঁর সৃজনশীলতাকে পোক্ত করেছে যার প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে স্পষ্ট। সৃজনশীল লেখালেখির মৌল প্রেরণা পেয়েছেন শৈশবের পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতাজাত শিক্ষা থেকে। ঢাকা শহরে অধ্যয়ন গ্রামের এক অগ্রজের মাধ্যমে শৈশবে বঙ্কিম রচনাবলির প্রথম খণ্ড পেয়েছিলেন। আজাদ লিখেছেন যদিও তিনি বেশি বুঝতে পারতেন না তবুও গলদঘর্ম হয়ে পড়ার যে অভ্যাস তা তাকে মানসিকতায় সমসাময়িকদের চেয়ে এগিয়ে রেখেছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের বোনেদের মধ্যে কমলা নামে একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন বইয়ের পোকা। আজাদ 'ঠাকুরমার ঝুলি' তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। শৈশবে সেই বইয়ের কল্পনারাজ্যে আজাদের বিচরণ ফুটে উঠেছে পরবর্তী স্মৃতিচারণায়–

> বারবার পড়েও আশ মিটতো না : রূপকথা জগতের আলো আঁধারিতে হারিয়ে যেতাম। ময়ূরপঙ্ক্ষী নাও চালিয়ে বাণিজ্য করতে সুদূরের দ্বীপপুঞ্জ, আর পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় আকাশরাজ্য দেশদেশান্তর। বুদ্ধুভূতুম, ব্যঙ্গমাব্যঙ্গমী। অরুণ বরুণ কিরণমালা। হীরামন পাখি। ঝর্ণার পানি ছিটোলেই পাথর করে ফেলা রাজপুত্রদের জাগরণ। একটার পর একটা সম্মোহন। ঝিরঝির বৃষ্টির রাতে দাদির কাছে শুয়ে শুনতে থাকলে সত্য মনে হতো, বিজন আঁধারে চলতে থাকলে গাছের নিচে বিশাল অজগরের মুখ থেকে ছেড়ে দেওয়া মাণিক্যও হয়তো দেখতে পাবো। সবচেয়ে বড় মজা, গভীর অরণ্যে নিঝ্‌ঝুম পুরীতে প্রদীপের আলোয় শায়িতা রাজকন্যা-থির মুখের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সোনার কাঠি রূপার কাঠি বদল না করা পর্যন্ত!।[৬]

বই পড়ে রস আস্বাদন করে পরবর্তীকালে সৃজনশীল রচনায় ব্রতী হন আজাদ তা বলাই বাহুল্য। ঠাকুরমার ঝুলির পর আজাদের বালক মনকে প্রভাবিত করেছে *বিষাদ-সিন্ধু* গ্রন্থ। আজাদ লিখেছেন :

> এরপর একটা কঠোর গ্রন্থ এল, বিষাদসিন্ধু। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। আমাকে পড়তে দিয়ে বাড়ির মেয়েরা ঘিরে থাকতেন। কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনী উচ্চারণ করে পড়ে যাওয়া থেকে মাঝে মাঝে থেমে পড়তাম, টপ্‌টপ্ করে আমার অশ্রুর ফোঁটা পড়ত বইয়ের পাতার উপর। মেয়েরা একটু হেসে, বিচলিত হয়ে বলতেন, থাক্, আর না।[৭]

আজাদের ছোটগল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পাঠের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবনা প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর লেখাতে : সপ্তম শ্রেণিতে গল্পগুচ্ছ এবং অষ্টম শ্রেণিতে গোর্কির ছোটগল্প পাই। 'কাবুলিওয়ালা' করুণার পাত্র হওয়ায় রাগ করেছিলাম, কিন্তু 'পোস্টমাস্টার' পড়ে কাঁদতে

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

কাঁদতে গাল ভেসে যেত। তবে ছোটগল্প হিসেবে মনে হয়েছিল 'শাস্তি'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। হঠাৎ করে–হ্যাঁ, হঠাৎ করেই বলবো, গোর্কির ছোটগল্প আমার চোখের সামনে এক আলাদা দরোজা খুলে দিল।"[৮]

আলাউদ্দিন আল আজাদ চরিত্র সৃজনের প্রয়োজনে হাটবারে ভ্রমণ করেছেন ভৈরববাজারে। আজাদ লিখেছেন :

> "এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন কত সিরিয়াসই না ছিলাম। হাটবারে ভৈরববাজার রাস্তার ধারে শতশত কানালুলা ফকির ভিখারি সুর করে চেঁচাত; কিন্তু আমি তখন অলিগলিতে ওই ধরনের চরিত্রের খোঁজে ঘুরে বেড়াতাম। কমলাঘাটে মাঝিদের মধ্যে কোন ডাকাত পাওয়া যায় কিনা, পরখ করতাম।"[৯]

উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত অবস্থায়ও চরিত্রের সন্ধান করেছেন লেখার প্রয়োজনে। আলাউদ্দিন আল আজাদের মানসগঠনে যুগপৎ ভূমিকা রেখেছে সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি, স্বদেশ, স্বকাল ও নিজের সংগ্রামশীল জীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে আজাদের জন্ম। রাজনীতি-সচেতন আজাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন। পারিবারিক সংগ্রামশীল জীবনের সঙ্গে ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং এর ধারাবাহিক ঘটনাবলি আজাদের মানসগঠনকে পোক্ত করেছে। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শহীদ মিনার ভেঙে দিলে তার কলম প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তিনি লেখেন 'স্মৃতিস্তম্ভ' নামক কবিতা। স্বকালকে ধারণ করে আজাদের লেখনী সর্বাবস্থায় কালোত্তীর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

আলাউদ্দিন আল আজাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে মনোজাগতিক বাস্তবতার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)-এর সিদ্ধান্তসমূহ যা বিশ শতকে মনোজগৎকে তথা শিল্পসাহিত্যকে প্রভাব বিস্তার করেছে। আদিম সংস্কার বিশ্বাস, যৌনচেতনা নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে নতুন ধারণা (Concept) পায় বিশ্ববাসী। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের The Interpretation of Dreams (1900), Introduction, lecture of Psycho-Analysis (1917), The EGO and the ID (1932) এসব গ্রন্থের মাধ্যমে যৌনতাই যে মানব মনের নিয়ামক সত্তা যা অবদমন করা যায় না, এ ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লব বাংলা সাহিত্যে কমিউনিজম-মার্কসিজম প্রভাবিত সাহিত্য বলয় তৈরি করে। এরপর ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জটিল বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে আলাউদ্দিন আল আজাদের আবির্ভাব।

আশৈশব সাহিত্যের পাঠক আজাদের মানসগঠনে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে 'বিষাদ সিন্ধু' কিংবা বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমের রচনাবলি,

---

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, গোর্কির গল্প, র‍্যাঁবো, ফ্রয়েডসহ বিশ্বসাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আজাদ। ব্যক্তিগত সংগ্রামশীলতাকে পাশে রেখে বাল্যবয়সে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখা আজাদের মানসগঠনে ভূমিকা রেখেছে তার জ্ঞানের প্রতি প্রবল তৃষ্ণা। চরিত্র সৃজনের প্রয়োজনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভেবেছেন, ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ, সাহিত্য সম্মেলন 'শান্তির জন্য কবিতা' সম্মেলনে যোগ দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন নিজেকে। বিদ্যায়তনিক পরিপাট্যে উজ্জ্বল এই মানুষের মানস গঠনের অনুষঙ্গ শিক্ষা, মানুষ, সমাজ ও স্বকাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পঞ্চাশের দশকের পরিপ্রেক্ষিতে আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা (১৯৩২-২০০৯) আলাউদ্দিন আল আজাদ। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সমালোচক। তিনি ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় একজন কর্মী ছিলেন। শতাধিক সাহিত্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য পঞ্চাশের দশকের এই সাহিত্যিক পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৫), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭৭), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৫) এবং একুশে পদকসহ অসংখ্য পদক।

শিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখালেখির হাতেখড়ি যুগান্তর পত্রিকায় 'নিমন্ত্রণ' পত্রাংশের মধ্যদিয়ে। তখন তিনি ছিলেন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সময়ে 'সওগাত' পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা 'আবেগ' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম ছোটগল্প 'জানোয়ার' প্রকাশিত হলে সাহিত্যসমাজে তিনি বিশেষ আদৃত হন। সে সময়কার বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'জানোয়ার' গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং প্রশংসা করে লিখেছেন–

> লেখা ছাড়বেন না; আপনার গল্পে যে অভিজ্ঞতা, শক্তি ও সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমাদের সাহিত্য ভবিষ্যতে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করবে, তাতে আমি নিঃসন্দেহ।[১০]

নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবন ও চরিত্রের উপর রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন। তবে ঢাকা শহরে উচ্চতর পড়াশোনার আগমনের পরে তাঁর সাহিত্যচর্চা নতুন মাত্রায় বিকশিত হয়। ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় প্রকাশিত হয় গল্প ও প্রবন্ধ। সে সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা–প্রত্যাবর্তন, চোখ, একটি রাতের চোখ, বৌদির জন্য কবিতা, হাসি উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলোর মধ্যে–চাকা, পাণ্ডুলিপি, বাতি। এছাড়াও প্রবন্ধ আরেক সভ্যতা, মানবতার রূপকল্পনা, গণসাহিত্য প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব সুনিশ্চিত হয়। এরপর থেকে তিনি লিখে গেছেন নিরন্তর যা বাংলা সাহিত্য-ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর লেখালেখি শুরুর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লিখেছেন :

> শুরুটা অবশ্য আকস্মিক কিন্তু তাতে নাটকীয়তা ছিলো না বরং মাটি থেকে শস্য গাছ, বৃক্ষলতা জন্ম নেয়ার মতোই সাধারণ। আমি এক বিশাল কৃষক-কাম সৌখিন ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। তাঁর বাড়িতে লেখাপড়া কিছু ছিল।

---

[১০] *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন সাহিত্য*, (সম্পা.) সিকদার আবুল বাশার, বাতায়ন প্রকাশন, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৩-১৪

> রবীন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুবরণ করেন আমি তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। সেদিন বিদ্যালয় ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই আমাদের পড়ানো হয়েছিল : আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। তখন থেকেই কবিতার প্রতি ভালোবাসা জন্মে। আমার এক চাচা আবদুল বারী, তিনি আমাকে লেখাপড়ায় উৎসাহ দিতেন।[১১]

তিনি কথাসাহিত্যের সৃজন প্রক্রিয়া নিয়ে বলেছেন :

> একজন লেখকের সৃজন প্রক্রিয়ায় ধরাবাঁধা নিয়ম আবিষ্কার যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সে সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায় না। কোন লেখা হঠাৎ করেই জন্ম নেয়, কোন লেখা দীর্ঘ সময় ধরে। জন ড্রাইডেন যে কল্পনার তিনটে পর্যায়ের কথা বলেছেন তা ঠিক তেমনিভাবেই আসে কি না সন্দেহ, কারণ কল্পনাকে ভাগ ভাগ করে পাওয়া যায় না। ড্রাইডেন বলেছেন, প্রথমে চিন্তালাভ, দ্বিতীয়ত তার বিস্তার এবং তৃতীয়ত বিচিত্রতা। আসলে প্রথমেই একটা একক হিসেবেই জ্বলে ওঠে একটা শৈল্পিক অভিজ্ঞতা।[১২]

উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি নিজের রচনারীতি প্রসঙ্গে বলেছেন :

> উপন্যাস রচনার আগে আমার পর্যবেক্ষণের জীবনধারা যখন কোন একটা সত্য নির্দেশ করে, তখন গল্পটা প্রাথমিক অবয়ব লাভ করে এবং খুব অস্পষ্টভাবেই উপন্যাসের বক্তব্য ও পরিসমাপ্তি দেখা দিতে থাকে শিল্পচেতনায়। এটাকে যদি পরিকল্পনা বলা হয়, তো মানতেই হবে তার যথার্থতা। তবে আমার ক্ষেত্রে একটা বিশেষত্ব দেখেছি, শুরুতে অবশ্য যে উপসংহারের কথা ভাবি বা আমার মনে উদয় হয়, লিখতে লিখতে শেষে গিয়ে অনেক সময়ই তা পুরোপুরি থাকে না—অন্যরকম হয়ে যায়।[১৩]

আলাউদ্দিন আল আজাদ শৈশবে দাদি ও বড় বোনের কাছে গল্প শুনতেন এবং তিনি নিজেও গল্প বলতে উদ্বুদ্ধ হতেন। ছোটবেলায় তাঁর চারপাশ ঘিরে মেয়েদের গল্প শোনার যে আগ্রহ তা তাঁর সাহিত্যিক হবার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। এভাবেই তিনি ঠাকুরমার ঝুলি, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু এবং ম্যাক্সিম গোর্কির ছোটগল্প পঠন-পাঠনে বিশেষ উৎসাহ পেয়েছেন। ঢাকা কলেজে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন তাঁর মনোজগৎকে পূর্ণতা দিয়েছে। সমাজকে অবলোকনের যে দৃষ্টি তিনি পঞ্চাশের দশকে পেয়েছেন তা তাকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের জীবন দর্শনের পেছনে সক্রিয় তার বিচিত্র পঠন-পাঠনরীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্তিত্ব জিজ্ঞাসায় উপনীত ব্যক্তির মনের অবদমিত চেতনা সিগমুন্ড ফ্রয়েড কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আজাদের কথাসাহিত্যের চরিত্রায়ণ কৌশলে মনস্তাত্ত্বিক সংকট, যৌনচেতনা ঘটনার কেন্দ্রে থেকে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভারতীয় ভূখণ্ডে রুশ বিপ্লবের প্রভাব।

---

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

যৌনচেতনা এসব বিষয় হিসেবে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন নরেশচন্দ্র সেন (১৮৮২-১৯৪৬), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আলাউদ্দিন আল আজাদের বেড়ে ওঠার কালে এসব লেখকের যুদ্ধ-পরবর্তী হতাশা, ক্লেদ, অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার বিষয় সমৃদ্ধ উপন্যাস ও গল্প আজাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যাকাশে উদিত হন। পঞ্চাশের দশকে আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্য : জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮) এসব গল্পগ্রন্থে যুগবৈশিষ্ট্য, নরনারী সম্পর্ক, মনস্তত্ত্ব, প্রেম বিষয় হিসেবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা লক্ষণীয়। মার্কসের 'কমিউনিস্ট মেনুফেস্টো' ও ডারউইনের 'অরিজিন অব থিসিস' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পপাঠে তাঁর মনোজগৎ বিকশিত হয় বলে বিভিন্ন সময়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। পঞ্চাশের দশকেই সমাজসচেতন, সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন ও জীবনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে কল্পনা প্রকাশের চেয়ে বাস্তবানুগ চিত্রের সাহিত্যকর্ম রূপায়ণে তিনি ছিলেন সদাতৎপর। পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই এবং বিশেষভাবে বায়ান্নোর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর কবিতায় রোমান্টিক মানস প্রবণতার চেয়ে সংগ্রামী চেতনা, সমাজ বাস্তবতাবোধ গভীর জীবনানুভূতি বাঙ্ময় হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তাঁর প্রতিবাদ ছিল যুগ-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। ওই সময়ে তাঁর রচিত 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটিকে অনেক সমালোচক স্বাধীনতার ইশতেহার বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ও দেশকালের প্রেক্ষাপটে রচিত সাহিত্যকর্ম আজাদের বিচিত্র প্রতিভার প্রকাশ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ পঞ্চাশের কথাসাহিত্যে বাস্তবতা-নির্ভর বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যতম বিশ্বস্ত রূপকার। যে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে তিনি লালিত ও বর্ধিত হয়েছেন তারই স্পষ্ট ছাপ তাঁর পঞ্চাশের দশকের গল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর পঞ্চাশের দশকের গল্পে বামপন্থি চেতনার সফল রূপায়ণ হয়েছে। সমকালীন দেশবিভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তর ও কৃষক-শ্রমজীবীদের বিদ্রোহ ও বিপ্লব তাঁর হাতে নবতর মাত্রা লাভ করে। পঞ্চাশের দশকে তাঁর তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে–*জেগে আছি* (১৯৫০), *ধানকন্যা* (১৯৫১) ও *মৃগনাভি* (১৯৫৩)। এসব গল্পের বিষয়কে তিনি সমকালসংলগ্ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> আসলে চল্লিশের দশকটা উপমহাদেশের বিপর্যয়কাল, এবং উত্তরণের পথ, অনেকের ধারণায় ছিল গণজাগরণ। রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের নেতৃত্বগ্রহণ। আমার প্রথম বই 'জেগে আছি'র (১৯৫০) গল্পগুলোতে এরই প্রতিচ্ছবি, বিশেষত প্রতিবাদ ও শ্রেণি সংঘর্ষ দেখা যায়। আমি বলতে চাই, এটা ছিল সমকালের প্রকাশ।[১৪]

[১৪] সিকদার আবুল বাশার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> আলাউদ্দিন আল আজাদের সামগ্রিক গল্পভুবন এই একটি ধারাতেই সীমায়িত নয়–গ্রামীণ জনপদের নিম্নবিত্তের জীবন-স্বপ্ন, দহন ও দীপ্র সংগ্রামের পাশাপাশি নাগরিক মধ্য ও উচ্চবিত্তের আকাঙ্ক্ষা, অসহায়ত্ব, আর্তি ও আত্মপ্রবঞ্চনা, উত্থান ও অবনমন : বাঙালির অবিস্মরণীয় অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধে অমর গাথা, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর অনাকাঙ্ক্ষিত নৈরাজ্যে নিয়ত বিচিত্র ভাঙন, এবং সেই সাথে পরাবাস্তবতাবাদ, সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অন্তর্ভেদী উৎক্ষেপ ও অভিব্যঞ্জনাতে তাঁর গল্পভুবন হয়ে ওঠে বহুধা বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়।[১৫]

ছোটগল্পের মতো কথাসাহিত্যের অন্য প্রকরণ উপন্যাসেও তিনি স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যকে তার সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান পুরুষরূপে তাঁর ভূমিকা অবশ্য উল্লেখ্য।[১৬]

আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাস প্রসঙ্গে অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খানের মন্তব্য স্মর্তব্য :

> একজন সম্পন্ন শিল্পীর আত্মকথনে এ উপন্যাসে যে জীবন রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসের পটভূমিতে তা অভিনব।[১৭]

আলাউদ্দিন আল আজাদের রচনার বৃহৎ অংশ সংগ্রামশীল জীবনের আখ্যান হলেও প্রেম ও মনস্তত্ত্ব-নির্ভর রচনার সংখ্যাও অনেক। তার প্রথম দিকের রচনা কমিউনিজমের অনুসারী হিসেবে মার্কসবাদের প্রভাবে প্রভাবিত। আজাদের কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সমাজ সচেতন অনবদ্য রচনা। আশপাশের চেনাজানা চরিত্রগুলোই ফুটে উঠেছে গল্প ও উপন্যাসে। সংগ্রামশীল জীবনের অধিকারী আজাদের ক্ষুরধার লেখনীতে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে। জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ রাজনীতি-সচেতন, সমাজবাস্তবতা-অনুসারী শিল্পী। বিজ্ঞানমনস্কতা তার রচনার মৌল বৈশিষ্ট্য। সংগ্রামশীল জীবন ও মনস্তাত্ত্বিক কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি অবিস্মরণীয়।

পঞ্চাশের দশকে তাঁর সাহিত্যকর্ম মার্কসীয় দর্শনে শুরু হলেও ষাটের দশকে কেন ফ্রয়েডিজমে ধাতস্থ হলেন সে প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন :

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

> মার্ক্সিজম থেকে ফ্রয়েডীয়তে যাইনি, শিল্প সৃষ্টির দায়ভারের কারণে, মার্ক্সিজম থেকে বৃহৎ পরিসরে জীবনোপলব্ধির কারণে গিয়েছিলাম।[১৮]

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আলাউদ্দিন আল আজাদের অবদান উল্লেখযোগ্য, তাঁর কথাসাহিত্যে দেশবিভাগ, দাঙ্গা-বিদ্রোহ, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ-বাস্তবতাসহ নানাবিধ বিষয়কে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে সাহিত্যে তার যে চিত্রায়ণ তিনি করেছেন তা প্রশংসার দাবিদার। পঞ্চাশের দশকের ঘটনাপুঞ্জ যেমন চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে তেমনি বিষয়বৈচিত্র্যের আলোকে প্রেম ও মনস্তত্ত্বধর্মী রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সংগ্রামশীল জীবনের অধিকারী আজাদের ক্ষুরধার লেখনীতে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকে অদ্যাবধি সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য রচনায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়।

---

[১৮] ড. ইবাইস আমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প : বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পরূপ*, ভাষাপ্রকাশ, ২০১৯, ঢাকা, পৃ. ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব

সহজাত সজাগ প্রতিভা স্বকালকে সাহিত্যে তুলে ধরে সমাজের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। একজন সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক সমাজকে নিগূঢ় পর্যবেক্ষণ করে সমাজ মানসের চরিত্রায়ণ করেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। যেহেতু সাহিত্যিক সমাজে লালিত ও বর্ধিত হন, ফলে সমাজের নানামাত্রিক ঘটনাচক্র তার মানসকে প্রভাবিত করে। জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সহযোগে সমাজের বিচিত্র রূপ ও সাহিত্যে বাস্তবানুগচিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়। আলাউদ্দিন আল আজাদ ষাটের দশকে সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে আপন সৃজনী প্রতিভা সহযোগে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড আবিষ্কারে সক্ষম হন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সদা পরিচিত আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর সাহিত্যকর্মে মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্ত উন্মোচনে প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ শতকের প্রথম থেকেই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ শুধু চিকিৎসা জগতে নয়, দর্শন-মনন তথা সৃজনের জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ঠিক একই সময়ে কার্ল মার্কসের শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় রুশ বিপ্লব মানুষের উপলব্ধিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা গবেষণার ফলে মানবচেতনার নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব তিনটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> Freud proposed three structure of the psyche or personality. ID, ego and supper ego. ID fers a selfish. Primitive, childish pleasure oriented part of the personality with no ability to delay gratification. Supper ego refers internalized societal and parental standard of good and bad, right and wrong behave ego refers the moderation between it and super ego which seeks compromises to pacify both.[১]

সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রভাব গ্রন্থে মোহিত কামাল উল্লেখ করেছেন–

> ফ্রয়েডীয় মত অনুযায়ী, মানবমনের সহজাত প্রবৃত্তি (ইনস্টিংক্ট) হচ্ছে জীবন প্রবৃত্তি (ইরোস) ও মরণ প্রবৃত্তি (থেনাটোস)। মানুষের সব আচরণের শেকড় গেড়ে আছে ইরোসের মূলে; যৌনতৃপ্তিই সেই শেকড়ের অন্যতম চাহিদা। বিশ্লেষকদের মতে, ফ্রয়েডী মতামতের পাশাপাশি সুররিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ প্রাধান্য দিয়ে যে অভিন্নতা গড়ে উঠেছে তার আলোকে ফ্রয়েডের কাছ থেকে অবচেতন মনের রহস্য উদ্‌ঘাটন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। হেগেলের কাছ থেকে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের সংস্কার এবং কার্ল মার্কসের কাছ থেকে দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার আবেগ

[১] M.D. Mahroof Hossain, psychoanalytic theory used in English literature : A descriptive study global Journal of human-Social-Science, global Journal, USA, 2017

> গ্রহণ করা হয়েছে। মনস্তত্ত্বের ফাইভ ফ্যাক্টর সূত্র অনুযায়ী আবেগের সঙ্গে চিন্তনের পারস্পরিক যোগসূত্র আছে। আবেগ বা চিন্তনের যে কোনো একটি মনঃক্রিয়া নাড়া খেলে আলোড়িত হয় অন্যটিও।[২]

হাফিজুর রহমান প্রেম ও মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন–

> ফ্রয়েডীয় মতে, মানুষের অনেক প্রচেষ্টাই মগ্ন চৈতন্য নিরুদ্ধ কামপ্রবৃত্তির অজ্ঞাত প্রেরণাবশেই অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে যৌন আকর্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া বা কামপ্রবৃত্তির দুর্বার সংকেতকে স্ফুটতর করে তোলা বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়। এতে ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়ে যিনি আপত্তি করেন তার আপত্তি সত্যের বিরুদ্ধচারী, সত্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা।[৩]

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকর্মে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষণীয়। চর্যাপদের পদকর্তাগণ কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর পদাকর্তাগণের পদগুলোতে মানব প্রেমের বিচিত্র লীলা, প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তলোকে বিচিত্র ভাবের স্পন্দন অপরূপ রমণীর ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যে নারী-পুরুষের হৃদয়ধারার সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দন তার আসল কারণ নিহিত আছে বৈষ্ণব কবিদের ভূমিকায়, যেখানে তারা প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপকার। বৈষ্ণবপদাবলীর শৃঙ্গার রস মধুর রস হিসেবে আবির্ভূত হয়ে হৃদয়ে ঐশীপ্রেমের ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করে মননে মানবীয় প্রেমের ভাব পরিস্ফুট করে পাঠক-চিত্তে রসানুভূতির স্তরে উত্তীর্ণ করতে সচেষ্ট ছিলেন পদকর্তাগণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণধর্মী রচনারীতির যাত্রা শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস *চোখের বালি*র মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব মনের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষের অবচেতন ভাবনাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। নারীর মনোজৈবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ পুরুষের দাম্পত্য জীবনের বাইরেও যেরূপ আকর্ষণ থাকে এরকম নানা অনুষঙ্গে মানব মনের অবদমিত ভাবনাগুলো *চোখের বালি* উপন্যাসের সমকালীন ও উত্তরকালীন সৃজন-কর্মে নবতর সৃজনশীল সাহিত্য সৃজনের পাথেয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসেও অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদ ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠার পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে মানব মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা-প্রযুক্ত অসংখ্য লেখনী প্রাসঙ্গিকভাবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল।

উপন্যাস যেহেতু মানুষের জীবনেরই প্রতিরূপ সেহেতু উপন্যাসে মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়। উপন্যাসের সূচনালগ্নে উপন্যাস ছিল ঘটনাপ্রধান কিন্তু কালক্রমে ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের চরিত্রায়ণ কৌশলে মানুষের মন ও মননকে প্রধান করে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন।

---

২ মোহিত কামাল, *সাহিত্য মনস্তত্ত্বের প্রভাব* ২০২২, পৃ. ২

৩ হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, পৃ. ১৭০

ঔপন্যাসিকের মানবমনের গহিন প্রদেশে অবগাহন করে বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রয়োগে মনস্তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস নির্মাণ করেন। আধুনিক উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেন–

> Life is a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. The thoughts, feelings and impression are the stuff of life. The reality and it is the task of the novelist to discover this reality. অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের realityকে খুঁজে বের করার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছায়।[৪]

বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছে *চোখের বালি* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এরপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* এবং *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসেও মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যা প্রযুক্ত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিককার উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের রহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন কাম-প্রেম-যৌনতা এসবের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের নবতর রীতি প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'শুভাশুভ' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন :

> উপন্যাস লেখার পুরনো রীতি আজও অনেকে আঁকড়ে আছেন–সেটা এই যে, উপন্যাসে কোনো চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিপূর্ণতার সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল! আমার প্রথম উপন্যাস পুতুল নাচের ইতিকথায় আমি প্রথম এই নিয়ম ভঙ্গ করি।[৫]

মানব মনের অন্তর্জগৎ ও চারপাশের বহির্জগতের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গোপন যোগসূত্র। মনের জানালা সেই যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়–

> মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে সাহিত্যের ভেতর থেকে খুঁজে পাওয়া যায় মনোবৈজ্ঞানিক কলাকৌশল, প্রত্যক্ষণ, আবেগ, চিন্তা, বুদ্ধি, প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, কগনিশন (অবহিতি বা সচেতনবোধ), অন্তর্গত প্রেষণা বা ভেতরের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা-উৎসাহ-উদ্দীপনা, শিক্ষা, বিশ্বাস, স্বপ্ন ইত্যাদি। এছাড়া চেতন-প্রাকচেতন-অবচেতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এর মধ্যে নিউরোসায়েন্স মতবাদ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে মানুষের মন ও আচরণ বিশ্লেষণে। নিউরোসায়েন্স মতবাদে আচরণের বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক কারণ খোলাস করা হয়েছে।[৬]

এছাড়া মানুষের আচরণ সৃষ্টিতে অবচেতনের অন্তর্গত শক্তির কথা বলা হয়েছে সাইকো ডাইনামিক মতবাদে। এই অন্তর্গত শক্তির উপরে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

---

৪ Virginia Woolf, The common reader (1925) 'Modern fiction,' Oxford Essential Quotations (4th ed.) : Susan Ratcliffe, online version publish-2016.

৫ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শুভাশুভ* : সৈয়দ আজিজুল হকের *মানিকের কথাসাহিত্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯

৬ মোহিত কামাল, সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব blrcbd.com/ ১১ই ডিসেম্বর ২০২০

আধুনিককালে মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসে মানব মনের গোপন রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী ঔপন্যাসিকদের নানা পরিচর্যায় উপন্যাস হয়ে ওঠে মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। মনস্তত্ত্বধর্মী উপন্যাসের প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব উপন্যাসে মানব মনস্তত্ত্বের ব্যবহার ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের সেই মনস্তত্ত্বধর্মিতা পরিচর্যায় বর্ধিত হয়ে *চোখের বালি* উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বধর্মী সাহিত্যকর্ম হিসেবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়া তিরিশের দশকের অন্যতম ঔপন্যাসিক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস *অন্তঃশীলা*, *আবর্ত*, *মোহন* নামকরণেই মনস্তাত্ত্বিকতার পরিচয়বাহী উপন্যাস। ধূর্জটি প্রসাদ মার্শাল প্রুস্ত কিংবা জেমস জয়েসের চেতনাপ্রবাহরীতির কৌশল প্রযুক্ত করে তাঁর উপন্যাসত্রয়ীকে সার্থক করে তুলেছেন। বাংলা উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধূর্জটি প্রসাদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় প্রেম ও মনস্তত্ত্বের যে রূপায়ণ শুরু হয়েছে আধুনিককালে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা-উদ্ভূত মনোবিকলন বা মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব। আধুনিককালে সৈয়দ শামসুল হক, রাজিয়া খান, সত্যেন সেন, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ সাহিত্যিক বাংলা উপন্যাসে মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নিবিড় পাঠক ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *অনূদিত অন্ধকার*, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*–এসব উপন্যাসে সিগমুন্ড ফ্রয়েড-উদ্ভূত যৌনচেতনার সঙ্গে মানব মনস্তত্ত্বের জটিলতা ও প্রেম

[৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চোখের বালি*র সূচনাংশ, সৈয়দ আকরম হোসেনের *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ২০১০

আবিষ্কারের প্রয়াস লক্ষণীয়। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর উপন্যাসে আধুনিক উপন্যাসের ফর্ম, ভাষা, শিল্পরূপ অনুসরণে মানব মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত প্রথম উপন্যাস। একে তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। একজন চিত্রশিল্পীর মনে রং আঁকার কথা বের করে আনা তথা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং চিত্রশিল্পীর জীবন ও প্রেমকে কেন্দ্রে রেখে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনি গ্রথিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ধারায় এটি নতুনতর সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালির* পর বাংলা উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার যে পথচলা শুরু হয় সেখান থেকে শেকড় সংগ্রহ করে আলাউদ্দিন আল আজাদ তার উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন, যা রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী হিসেবে পেলেও কবিত্বের রোমান্টিক কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি, অবাস্তব আদর্শবিলাস, কবিতাময় জীবনানুভব এবং ব্যক্তিক চেতনা সহযোগে মনস্তত্ত্বের প্রকাশ আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসকে স্বতন্ত্র করেছে। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাস ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে 'পদক্ষেপ' পত্রিকার ঈদসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

চিত্রশিল্পী জাহেদের আপন ভাষ্যে এই উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। আর্ট স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র জাহেদের সঙ্গে রঙের দোকানে হঠাৎ করেই পরিচয় ঘটে জামিলের। জামিলের অনুরোধে তাকে বিজ্ঞাপন আঁকার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে জামিলের বোন ছবির সঙ্গে পরিচিত হয় জাহেদ।

> এভাবেই ভাইবোনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, খানিকটা অস্বাভাবিক, কিন্তু অসাধারণ কিছু ছিল না। খেতে বসে জামিল বলেছিল জানো জাহেদ, ছবি সত্যিই ভালো মেয়ে। ও না থাকলে আমি রাস্তায় পড়ে মরতাম।[৮]

ছবির সাদামাটা মায়াময়ী ভাব জাহেদকে আকৃষ্ট করে। ছবির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে জাহেদ বারবার জামিলদের বাড়িতে যেতে থাকে এবং জাহেদ ও ছবির মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ ভালোবাসায় রূপ নেয় এবং জাহেদ ও ছবি পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করে।

> ছবি এমনি, কেমন মায়াময়ী! চোখ দু'টি স্বপ্নাচ্ছন্ন, গতি ধীর মন্থর। অতি কাছে থাকলেও অনেক দূরে। একদিন দেখি পরিচয় হওয়ার পর থেকে যত নারীমূর্তি এঁকেছি, প্রত্যেকটিতেই ওর আদল, কোনোটায় মুখের গড়ন,

---

[৮] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ২৪

কোনোটায় দেহের ভঙ্গি, কোনোটায় চোখের দৃষ্টি। আমি সজ্ঞানে কোন দিন ওকে আঁকতে চেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ এমন, এর অর্থ কী। অলৌকিক কিছু নয়, তবে নিশ্চয়ই রহস্যময়।[৯]

জাহেদ ও ছবির প্রেমের উত্থান এবং প্রেমকে লালন করার তীব্র সৌন্দর্যের বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসটির সূচনা ঘটে।

কম্পিত বুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি, মেঝের ওপর ছবি ঘুমোচ্ছে! শিথিল বসন, গভীর ঘুমে সে মগ্ন। সুডৌল পরিপূর্ণ দেহ। সুন্দর ঠোঁটজোড়া।[১০]

জামিল এক সময় ছবি-জাহেদের পারস্পরিক প্রেমের কথা বুঝতে পারে। জামিলের উদ্বিগ্ন মন বিয়েতে বাধা দেয়। জামিল মনে করত বিয়ে সত্যিকারের শিল্পী হওয়ার পথে অন্তরায়। তাই জাহেদের বিয়ের প্রস্তাবে জামিল রাজি হতে পারেনি এবং তাকে আঘাত করে অসুস্থ হতে বাধ্য করেছে :

১. একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জামিল বলল, দেখ জাহেদ! তোমাকে একটা কথা বলব কিছু মনে করো না। জীবনকে গড়ে তোলা সত্যি কঠিন কাজ। বিশেষ করে, শিল্পীর জীবন। শিল্পীর জীবনে প্রেম দরকার, কিন্তু তাতে জড়িয়ে পড়লে চলবে না।[১১]

২. আমি শিউরে উঠে একহাত পিছিয়ে যাই। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার আগেই কোমর থেকে খুলে নেওয়া ওর মোটা চামড়ার বেল্টের সপাং আঘাত আমার গায়ে পড়তে থাকে।[১২]

কলকাতার আর্ট স্কুলে পড়াকালে সহপাঠিনী মীরা দাশগুপ্তার সঙ্গে জামিলের পরিচয় ঘটে, পরিচয় থেকে প্রেমে আবদ্ধ হয় তাঁরা। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে বিরাগ জন্মালে তারা পৃথক হয়ে বসবাস করতে থাকে। জামিল অসুস্থ হয়ে পড়লে জাহেদ মীরাকে ডেকে আনে এবং মীরা অসুস্থ জামিলের আবারও সেবা করতে শুরু করে। তাদের পুনরায় পারিবারিক মিলন ঘটে।

মীরা নড়তে পারছিল না, আমরাও কতকটা আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ চেয়ে দেখার পর জামিল ত্রস্তভাবে খাটের উপর থেকে নামল, ছুটে গিয়ে ব্যাকুল গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলতে থাকে, মীরা! আমার মীরা! আমাকে রক্ষা কর, মীরা! আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি, আমাকে বাঁচাও।[১৩]

জাহেদ ও ছবির মধ্যকার অপূর্ণ প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে মীরার সহায়তায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে।

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

> ছবি আমার সহধর্মিণী? জীবন-সঙ্গিনী, সাদা কথায়, বৌ? ভাবতে অবাক লাগে বৈকি। ছোটবেলা থেকেই একটা কঠিন সংকল্প ছিল বড় হব। বিয়েশাদি ব্যাপারটার কথা কখনো চিন্তা করিনি। এমনকি বড় হয়েও ওসব পথের ত্রিসীমানাও মাড়াইনি। অথচ আশ্চর্য আমি প্রেমে পড়লাম এবং যাকে ভালোবেসেছি তাকে বিয়েও করলাম।[১৪]

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের ব্যবহার ঘটেছে প্রধানত জাহেদের মনোলোকে। বিয়ের প্রথম রাতে জাহেদ আবিষ্কার করে যে ছবির দেহে মাতৃত্বের স্পষ্ট চিহ্ন। জাহেদের মনোজাগতিক সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ পর্যায়ে। দীর্ঘ কয়েকদিন টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়ে সে ছবির কাছে প্রশ্ন করে—কেন ধোঁকা দিলে? এ প্রশ্নের উত্তরে ছবি কোনো রকম ভণিতা না করেই অতীতের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বর্ণনা দেয়। ছবি জানায়, জামিলের কাছে আসা এক ব্যবসায়ী পশুর হাতে ধর্ষণের শিকার হয়। এতে ছবি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তবে, পরে গর্ভপাতের মাধ্যমে ওই ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু ছবির গর্ভে যেহেতু বাচ্চা এসেছিল, সেহেতু শিশুর কান্না শুনলেই তার বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠে। কীভাবে ছবি ধর্ষিত হয়েছিল তার বর্ণনা করেছে জাহেদের কাছে–

> লোকটা ভয়ানক ধূর্ত আর যতদূর সম্ভব বদমাশ। দু'দিন পরে এসে দাদাকে ডাকতে ডাকতে একেবারে বাড়ির ভেতর চলে এলেন। দাদা ছিলেন না। আমি সরে পড়বার উদ্যোগ করেছিলাম; কিন্তু বাসায় লোকজন নেই বুঝতে পেরে সে–কথা থামিয়ে ছবি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, আমার শিথিল হাতটার দু'টি আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আমি চিৎকার করতে চেয়েছি, মুখের ওপর জুতো ছুড়ে মেরে বাধা দিয়েছি। কিন্তু বেশিক্ষণ পারিনি। সারা বিকেলটা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদলাম। এও কপালে লেখা ছিল? কাকে বলব, কেমন করে বলব?[১৫]

গর্ভপাতসহ মনোজাগতিক সংকট এড়িয়ে ছবির মুখে ধ্বনিত হয় জাহেদকে ঘিরে তার ভালোবাসার জগৎ। জাহেদের প্রতি তার আকর্ষণ, তার প্রথম প্রেমাকাঙ্ক্ষা সবই স্পষ্টীকৃত হয়েছে এ পর্যায়ে।

> বিছানায় ফিরে এসে দেখি অকাতরে ছবি ঘুমাচ্ছে, এতদিনকার পুষে রাখা মেঘের ভারটুকু ঝরিয়ে যেন এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। কিন্তু রাতের ঘুমে যা সম্ভব হয়েছে, সকালের আলোতেও কি এ অক্ষুণ্ন থাকবে? থাকতে পারে, তার একটা মাত্র উপায়। সে হল, আমার আনন্দ ও উচ্ছলতা। কাল সকালে আমি যদি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারি, তখন ওর ওপরে তার যে আভা পড়বে, তাতে ওর অন্তর-বাহির একটি শিখায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে। শান্তির বদলে ক্ষমা, সঙ্কীর্ণতার বদলে মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে হবে আরো কৃতজ্ঞ।[১৬]

জাহেদের উপলব্ধির চিত্র ফুটে উঠেছে এ পর্যায়ে। জাহেদের অনুভবে ছবির দুর্ঘটনাকবলিত সময়কে ছবির নিতান্ত অসহায়ত্ব বলে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাহেদের ভাষ্যে, ছবির অতীত জীবন, গর্ভধারণ, গর্ভপাত এসবের পরে মানবিকতাপূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে :

---

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

> আমি সামান্য আঘাত করলেই এখন সে মুষড়ে পড়বে, এবং তা'তে আমার মনের ঝাল মিটবে; কিন্তু ঐটুকুই, আর কোনো লাভ নেই। অপরপক্ষে, ইচ্ছে করলে, আমি এখনো ওকে আরো মঞ্জরিত করে তুলতে পারি, করতে পারি আরো সার্থক ও সুন্দর। তার জন্য প্রয়োজন প্রেম ও ক্ষমা।[১৭]

জাহেদের আত্মোপলব্ধির জগতে নতুন ভাবনা হিসেবে ছবির অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে জাহেদ। জাহেদের মনোজগতে মুগ্ধসত্তার জাগরণ ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদের মানসজাত।

> 'যে আমারে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায় ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি', তারই পূজায় বলি হবার ইচ্ছেটা তো শুধু লাবণ্যের নয়, বরং এটা আকাঙ্ক্ষিত জনের কাছে নরনারী-মাত্রেরই হৃদয়ের দাবি? এখন, আমি ওকে ভালোবেসেছি কিনা এটাই প্রশ্ন। যদি বেসে থাকি তা'হলে এতটুকু ক্ষমা করতে পারবো না? বিশেষতঃ এ যখন একটা দুর্ঘটনা-মাত্র, যার আবর্তে সে একান্ত অসহায় ছিল?[১৮]

জাহেদের ঔদার্য, মানবিকতায় ছবি জাহেদের প্রতি গভীর আস্থা-ভালোবাসার বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হয়। মানব মনের বিচিত্র প্রান্তের উন্মোচন প্রেক্ষাপটে আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রয়াস ঈর্ষণীয়। জাহেদের সংসারে প্রথম সন্তান টুলটুল, তা যেন তাদের ভালোবাসার প্রথম পুষ্প, তাদের যোগাযোগের মাধ্যম, বন্ধনের কেন্দ্রবিন্দু। জীবনে আনন্দ-বেদনার চেয়েও হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত প্রেমও যে একজন শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম হতে পারে, এ উপন্যাসের জাহেদ চরিত্রের মধ্যদিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মায়ের কোলে শিশুর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছে জাহেদ। ছবি ও টুলটুলের একটি ছবি এঁকে সে ছবিটির নাম দেয় 'মাদার আর্থ' অর্থাৎ বসুন্ধরা। পাকিস্তানের জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে ছবিটি প্রথম পুরস্কার পায়। স্নিগ্ধতায় ভরা সেই ছবিটির সৃজনকাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে জাহেদ উপন্যাসের গল্প বলতে শুরু করে।

> নিজের ঊর্ধ্বে উঠতে পারাটাই শিল্পী ব্যক্তিত্বের সর্বপ্রথম অঙ্গীকার। এবং সে আমারও লক্ষ্য। এখন শেষ দুঃখ শেষ সুখের সামনেও মূর্ছিত হয়ে পড়ি না এতেই আমি সন্তুষ্ট।[১৯]

জাহেদের পতিতালয় গমনের বর্ণনা আছে। জাহেদের এ কাজের সঙ্গী মুজতবা। তার সাথে পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে এখানে–

---

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১. আমি আর মুজতবা যেদিন চাটগাঁ গিয়ে পৌঁছলাম, সেদিন ছিল শুক্রবার। সারারাত প্রায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো, কাজেই একফোঁটা ঘুম হয়নি। এই শহরে বন্ধু-বান্ধব আছে, গিয়ে উঠলে অনাদর করবে না হয়তো; কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় নেই।[২০]

২. না মাতাল হইনি, তবে নেশাগ্রস্ত আছি বৈকি। এ নেশা এক অদ্ভুত নেশা, সব ভুলিয়ে রাখে। সত্তাকে ডুবিয়ে দেয়, ঢেকে রাখে মায়াবী আচ্ছাদনে।[২১]

জাহেদ-ছবির বাইরে অন্য উপ-আখ্যান হিসেবে মগকন্যা তিনার সঙ্গে মুজতবার ব্যর্থ প্রেম এ উপন্যাসের অন্যতম অনুষঙ্গ। মগকন্যা তিনার সঙ্গে মুজতবার পাহাড়ি এলাকায় বিচরণ সবই উপ-আখ্যান হিসেবে উঠে এসেছে এ উপন্যাসে–

মগপল্লীর দিকে। কাজ করতে এসেছি, বসে থাকবার জন্যে নয়! ওর চেহারায় এমন দৃঢ়তা, আমি না গেলে, একলাই যাবে। অগত্যা তৈরি হলাম। নদীর পাড় ঘেঁষে নতুন বপন-করা শালবন, এর পরে জঙ্গল এবং তার কাছাকাছি দিয়ে ছোট পাহাড়মালা। সীতা পাহাড়ের শাখা-প্রশাখা। পাহাড়ের ঢালুতে একটা মগপল্লী।[২২]

মুজতবার অবচেতনে তিনার প্রতি প্রেমাবেগ প্রকাশিত হয়েছে গভীর মমতায়, ভালোবাসায়। অন্ধকারে তিনার আগমনে শাহাদাৎ, সালামতকে বন্দুক আনতে বলে। তিনার পিছু পিছু ছুটে যায় মুজতবা।

তিনার অট্টহাস্য দূরে সরে যাচ্ছিল, দুপ্‌দুপ পায়ে সে ছুটছে। খটাস করে গেটটা খুলে বেরিয়ে গেল। কি ঘটে যাচ্ছে, এক মুহূর্ত আমরা বিভ্রান্ত হতবাক। পরমুহূর্তে ঘোর কাটলে আমি বলে উঠলাম, সর্বনাশ! মুজতবা যাচ্ছে! ও বিপদে পড়বে! চল, আমরা যাই পিছু পিছু! দেরি করো না চল![২৩]

জাহেদের পাকিস্তান থেকে পুরস্কার পেয়ে বিমানে করে ঢাকায় ফিরে আসা ও ছবি-টুলটুলকে কাছে টেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে।

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন উপন্যাসে মনোজাগতিক সংকট ও মনোবিশ্লেষণের নৈপুণ্যে আঙ্গিকগত ও বর্ণনাভঙ্গি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। বিলকিসের দাম্পত্য স্মৃতি ও বর্তমানের নৈঃসঙ্গতা সহযোগে তার দায়িত্বশীল পারিবারিক ভূমিকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিলকিসের লিবিডোতাড়িত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা জীবনের শূন্যতা স্বগত কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

---

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-১৮

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

> শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন উপন্যাসে সাঁইত্রিশ বছরের বিগতা যৌবনা বিলকিস বানুর নিঃসঙ্গ, কামনাতাড়িত যন্ত্রণাদগ্ধ মানসরূপ উন্মোচন করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।[২৪]

এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিলকিস বেগমের আত্মসংরক্ষণের এবং নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের দুটো আশ্রয় নির্দেশ করেছেন। এক. ধর্মগ্রন্থ, দুই. নার্সারির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

বিলকিস বানুর প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে দুই সন্তান খোকন ও পারভীন যেন তার যন্ত্রণার সহযাত্রী। মৃত স্বামী সম্পর্কে বিলকিস বানুর অনুভূতি :

> ঘৃণা সংশয় আর আতঙ্ক ছাড়া মনের মধ্যে তার কিছুই জন্মাতে দেয়নি। লোকটি ছিল অতৃপ্ত অসহায় বোবা পশুর মতো, যৎসামান্য আদর দিলেও পায়ের কাছে গোলাম হয়ে থাকত। কিন্তু বিলকিস তা দিতে পারেনি। চামড়ার ব্যবসায়ী, গায়ে এতটা কুৎসিত দুর্গন্ধ যেন মাখা কিন্তু তারচেয়ে বড় ব্যাপার সকল স্বপ্নের প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।[২৫]

তার স্বামী যেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের মধুসূদন ঘোষালের মতো সম্পদশালী অথচ অমার্জিত, অশিক্ষিত, অসংস্কৃত। এমন অর্থলোভী ও অশিক্ষিত পুরুষের সঙ্গে সংসার করে শিক্ষিত বিলকিসের যৌবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বিলকিস আসলে কলোনিশাসিত সমাজের মুৎসুদ্দি-চরিত্র স্বামীর অসংস্কৃত ব্যবহারে বিক্ষত বিবর্ণ এক নারী :

> নিঃসঙ্গ, পাতা শুকিয়ে যাওয়া ঐ ঝাউ গাছটার মতোই একা, একটি নার্সারি স্কুলে কাজ করেন, সপ্তাহে তিন দিন যেতে হয়, কিন্তু এতেও ফাঁকটুকু ভরে না। তিন দিন কাজ করেন, তবু মনে হয় সারাক্ষণই এই বাড়িটা অনড় জড় পদার্থের মতো।[২৬]

স্বামীকে হারানোর পর বিলকিস বানুর মনোজাগতিক সংকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

> দরিদ্র খালাতো বোনের ছেলে কামালকে মেয়ে পারভীনের জামাই নির্বাচন করতে গিয়ে সে কামালের স্পর্শে শীতার্ত যৌবনে জেগেছে অকাল বসন্তের উন্মাতাল কামনা।[২৭]

প্রৌঢ় বিলকিস বানুর অতৃপ্ত কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মেয়ে পারভীনের জামাই কামালের স্পর্শে।

> একি অদ্ভুত পরিহাস! চোখে এসে সাপটে গেল হাত জোড়া! কেমন কোমল আর উষ্ণ। কিন্তু আঙ্গুলগুলোর মধ্যে বোধ হয় বিদ্যুৎ ছিল, নইলে দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল সে কোন প্রবাহে?[২৮]

---

[২৪] হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ১৭২

[২৫] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৮৪

[২৬] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৫৮

[২৭] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৫৮

[২৮] *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২, পৃ. ৩১

বিলকিসের মনোজগতে প্রেমাবেগের তীব্রতা অনুভূত হতে থাকে, তীব্র যৌনাকাঙ্ক্ষা তার কর্মজগতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এমনি বর্ণনা উপস্থিত হয় যখন কামাল সহযোগে বিলকিস গৃহে ফিরছিল সেদিনের প্রেক্ষবিন্দুতে। লিবিডোতাড়িত বিলকিসের সঙ্গলিপ্সু মন কামালের সঙ্গ পেয়ে যৌনাবেগের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আবেগে নতুন সত্তায় উপনীত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক আজাদের বয়ান নিম্নরূপ :

> বিলকিস নিজেই ধরে ওর হাতটা কাঁধের উপর দিয়ে রাখলেন। রিকশার ঝাঁকুনির সঙ্গে সুগন্ধি তেলে ফুলিয়ে বাঁধা খোপাটা কাঁধে চাপ খাচ্ছে, পিঠটাও মাঝে মাঝে হাতে এসে লাগে। কপালের দু'পাশের রগ দুটো ছটফট করছে, কামালের চোখের মণি কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। সংকট মুহূর্ত! অসম্ভবের দেয়াল বেয়ে পিছলে পড়া এক প্রকার ঠাণ্ডা অনুভূতিতে হৃৎপিণ্ডটা ঢিবঢিব করতে থাকে। বিলকিস কাতর স্বরে বললেন, বড্ড মাথা ধরেছে, ইস! প্রথম বাঁ হাতের আঙুলে কপালের সামনেটা চেপে ধরলেন, এরপর মাথাটি এলিয়ে দিলেন। দেহটা কাঁপছে একটু একটু; কতকটা অচৈতন্য হয়ে পড়ার মতো। কামাল নিজের হাতটা সরিয়ে নিল না তার ঘাড়ের নিচ থেকে, বরং ডান হাতেও পেটের কাছে ধরে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'খুব খারাপ লাগছে আপনার? হ্যাঁ, বিলকিস অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, আমাকে ধরে রাখো তুমি।[২৯]

বিলকিস বেগমের যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ নির্মাণ করেছেন সমাজ বিরুদ্ধ তথা সামাজিক নীতি বিরুদ্ধ বাস্তবানুগ চিত্র। মেয়ে পারুর সঙ্গে কামালের সঙ্গম দেখে বিলকিস বেগম কল্পলোকে মিলিত হন; আবেগাক্রান্ত হয়ে প্রেমবাসনার পরিণত সত্তার কাছে পৌঁছাতে চান বিলকিস বেগম। কামাল পারুর সঙ্গমের মাঝে নিজে পারু সেজে হাজির হয়েছেন কামালের কাছে। কামালের সঙ্গে মিলনের বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক :

> কামাল কপাট দু'টো ফাঁক করেই ঝড়ের বেগে এগিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ঝুঁকে পড়লো।[৩০]

কামালের সঙ্গে বিলকিস বেগমের মেয়ে পারুর কথাবার্তা, হাসি-আনন্দের মুহূর্তগুলো বিলকিসের বেদনার কারণ হয়েছে। শ্রী-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> অবৈধ প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতম বিক্ষোভ ও প্রবল আবেগ সঞ্চিত হইয়া ওঠে তাহা ঔপন্যাসিকের পরম প্রার্থনীয়। এই সমস্ত বিষয় বিচারে যদি আমরা খুব গোঁড়া ও সংকীর্ণ নীতিবাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকি, তবে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-রসাস্বাদন হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিব।[৩১]

---

[২৯] *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২, পৃ. ৪৮

[৩০] *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২, পৃ. ৮১

[৩১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ২০০১, পৃ. ৪৪৯-৪৫০

বিলকিস কামালের ছোঁয়া পেতে চায় ক্ষণিকের জন্য; জীবনের সত্য-মিথ্যা, নীতি আজ তার কাছে তুচ্ছতম বিষয়। বিলকিস বেগমের কথা পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক। কামালের কক্ষে গিয়ে প্রবলভাবে নিজেকে সমর্পণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে বিলকিসের বক্তব্যে :

> মশারির প্রান্তটা তুলে আস্তে আস্তে শিয়রের ধারে বিছানায় বসতে হবে; এরপর মুখের কাছে ঝুঁকে মাথার চুলে আদর করা। এতেই যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে কোন বিপত্তির আশঙ্কা নেই; তৎক্ষণাৎ পরিচয়টা দিয়ে শান্ত থাকতে বললেই হল। এরপর উঠে বসলেই সমস্ত বোঝাপড়া। ওগো স্বপ্ন আমার, আমার চোখের মণি, হৃদয়ের ধন। আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব, নবীন দেবতা, আমাকে তুমি তোমার দানে ভরিয়ে তোলো। আমাকে শান্ত করে চোখ বুজিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে দাও![৩২]

বিলকিসের মনোজাগতিক পরিস্থিতি তথা প্রেম-যৌনাকাঙ্ক্ষাসমেত জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সমালোচক। তিনি লিখেছেন :

> কামাল আর পারভীনের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠুক, এটাই তার কাম্য। কিন্তু কামালকে দেখে তার সুপ্ত অতৃপ্ত বাসনা জেগে ওঠে। নিজের সুপ্ত কামনার জাগরণ এবং একটি বিচিত্র অনুভূতির শিহরণ বিলকিসের দেহে আর মনে। এই বিচিত্র জটিল মানসিকতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এ উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে।[৩৩]

পারভীন-কামালের বিবাহপূর্ব ঘনিষ্ঠতার প্রেমময় প্রকাশে দগ্ধ হয়ে বিলকিসের নিঃসঙ্গ অন্তর্লোক এতদসত্ত্বেও শিল্পের সীমা অতিক্রম করেননি ঔপন্যাসিক। কামাল-পারভীনের বিয়ের ব্যবস্থা। উচ্ছৃঙ্খল বড় ছেলে খোকন মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তার পছন্দমতো মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে সম্মতি জ্ঞাপন এভাবেই বিলকিস বেগমের জীবন এক শীতার্ত মোহনায় এসে উপস্থিত হয় মনস্তত্ত্বের গভীরতার পথে।

> রাতের পরে সকাল, সকালের পরে বিকেল এবং বুকের ভেতর আবার হুহু করে সেই জ্বালা, আবার এক অবুঝ যন্ত্রণা। একা একা, নিভৃত ভাবনায় নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে যতই ইচ্ছা করেন, বেলাভূমিতে ঘা লেগে ঢেউয়ের ফেনিল হয়ে ওঠার মতো বিন্দু বিন্দু আবেগের কাঁপুনিগুলো আছড়ে মরে। একি অর্থহীন ছেলেখেলা! দুপুরের পরে নিঝঝুম বাড়ি। আলোর ঝিলিমিলি, হাওয়ার শিহরণ, পাখির কলকাকলি–প্রতিদিনের মতোই আটপৌরে সাধারণ চিত্র; তবু গতদিনের বিকেলের মতো এতে তো শূন্যতার চাপ নেই! বরং একটি সম্ভাবনার রেশ তুলোর মতো হালকা সাদা মেঘে নীল আকাশ ধীরে ধীরে ভরে ওঠার মতো সবকিছুকে অর্থময় করে তুলেছে। বলে গিয়েছিল, আজ সে আসবে। প্রচণ্ড একটা আঘাত খেয়ে যদি হঠাৎ স্মৃতি বিলুপ্ত ঘটত! খুলির

---

৩২ *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২, পৃ. ১২৫

৩৩ মনসুর মুসা, *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, অডর্ন, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৯১

> ভিতরে কোষে-কোষে জবজবে রক্তক্ষরণে একাকার হয়ে যেত সব। তাহলে মন আর এমন করে আয়োজনের জাল বুনে তুলতো না।[৩৪]

স্বামীহীন উচ্চ মধ্যবিত্ত নারী বিলকিসের মনোজাগতিক সংকল্প, তার যৌনাকাঙ্ক্ষার তীব্রতম প্রকাশ এবং ফলস্বরূপ তীব্র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আবহে পীড়িত হয়ে ওঠার কাহিনি-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ উপন্যাসের সমালোচনায় রফিকউল্লাহ খান লিখেছেন :

> উপন্যাসের শেষে, চৈতন্যের সর্বময় শূন্যতার মধ্যে যদি আমরা বিলকিসকে আবিষ্কার করতাম তাহলে সেটাই হতো বাস্তব-সম্মত। ঔপন্যাসিকের হ্যাঁ-অর্থক জীবনবোধে উত্তরণের আকস্মিকতায় একটি সম্ভাবনাময় শিল্পের যেন অপমৃত্যু ঘটলো। তবে লিবিডোর গোপন পিচ্ছিল অন্ধকার থেকে 'অবিরল অশ্রুধারা'য় 'ছোটদের দুর্বার আলিঙ্গনের মধ্যে' সবুজ ঘাসের পটভূমিকায় বিলকিসের অবস্থান নিঃসন্দেহে ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক জীবন-চিন্তার পরিচয়বাহী।[৩৫]

সমাজ-বিরুদ্ধ প্রবল যৌনাবেগের তীব্রতা তাকে বাহ্যিক জ্ঞানপূর্ণ করে তোলে। মনস্তত্ত্বের জটিল পীড়নে নিজের মেয়ে পারভীন ও তার স্বামী কামালের সঙ্গমে দিকশূন্য হয়ে নিজের জীবনের শীতার্ত বাস্তবতায় উপনীত হয়েছেন এবং নবদম্পতির জীবনে বসন্তের সূচনা হয়েছে যা তাৎপর্যবাহী। আলাউদ্দিন আল আজাদের শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন মনোজাগতিক সংকট ও মনোবিশ্লেষণ (Psycho-Analysis)-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

> ফ্রয়েডের মতে, মানুষের অনেক প্রচেষ্টাই মগ্নচৈতন্য-নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তির অজ্ঞাত প্রেরণাবশেই অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬]

বিলকিস বেগমের চারিত্রিক সংকট ও স্বভাব-বিরুদ্ধ কামপ্রবৃত্তি ফ্রয়েডীয় চেতনার বাস্তবানুগ চিত্র। আজাদ উপন্যাসটির অন্তর্বয়নে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন।

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রয়োগ করেছেন; জ্যোৎস্নার মনোজাগতিক বিষয়কে বর্ণনা করেছেন দেশজ শব্দ ও ভাষার অনুষঙ্গে, ফলে তা প্রান্তিক মানুষের মনোজগতের জটিলতম সমীক্ষণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। উপন্যাসের কথক সালাম, যার প্রেক্ষণ বিন্দুতে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

---

৩৪ *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৩৫ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৫৮

৩৬ হাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

> কিঞ্চিৎ আশ্চর্য লাগছে বৈকি। শুনেছি গতিই জীবন; এবং প্রকৃতপক্ষে গতির আরেক নাম আধুনিকতা। আমাদের ক্ষেত্রে দুটোই মনে হয় একই সঙ্গে সত্য হয়েছে, নইলে গতকাল দুপুরেও জানতাম না পরদিন সকাল বেলাই এমনিভাবে আমাদেরকে সাগরজলে ভাসতে হবে। বেশ ভাল লাগছে আমার। এমন মুহূর্তগুলো আমার কাছে বিশেষভাবে উন্মাদনাময় হয়ে ওঠে সেই জন্য যে, আমি তখন আমার প্রিয় বান্ধবী জ্যোৎস্নাকে এক অভিনব রূপে দেখতে পাই। তার অনেকটাই থাকে রহস্যে ভরা; কিন্তু যেটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাও যথেষ্ট মূল্যবান।[৩৭]

ঔপন্যাসিকের অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে জ্যোৎস্নার জীবনের নানামাত্রিক ঘটনার বয়ন কৌশলের অভিনবত্বে :

> মেডিকেল কলেজের গাইনোকলোজি ও মিডওয়াইফারীর প্রফেসর ডাক্তার মমতাজ জাহান বেগম। তার ডাকনাম জ্যোৎস্না, তা কেউ জানে না।[৩৮]

জ্যোৎস্নার সঙ্গে ডাক্তার করিমের প্রণয়ের বর্ণনাও উপস্থিত করেছেন ঔপন্যাসিক–

> ডাক্তার করিম একজন অত্যন্ত গুরুতর লোক, একজন নিঃস্বার্থ নীরব প্রেমিক। ইংল্যান্ডে থাকতে পুরো সাত বছর ধরে এবং দেশে আশার পর থেকে এখনো জ্যোৎস্নার পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, যে কোন সাধনার সিদ্ধি আছে; জ্যোৎস্না একটি নিরেট পাথর। পাথর একদিন গলবেই।[৩৯]

ডাক্তার জাফরের দীর্ঘ লালিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে :

> জ্যোৎস্না, ইউ আর এ্যান ইনটেলিজেন্ট গার্ল এ্যান্ড চেরিটেবল ট্যু! তুমি বুঝতে পারছো নিশ্চয়, আমি ভিজিট চাই না। ওষুধের দাম চাই না। ধার ফেরৎ চাই না। তুমি যদি কথা শোনো, তাহলে আর কিছুছু চাই না। দুনিয়া চাই না, আখেরাত চাই না, সব তোমার পায়ে ঢেলে দেবো।[৪০]

জাফরের মনোবাসনা বুঝতে পেরে জ্যোৎস্নার প্রত্যুত্তর–

> খবরদার! আমার দিকে আর এক পাও এগুবেন না।[৪১]

পুরুষসুলভ অচরিতার্থ বাসনা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে, 'জ্যোৎস্না প্রাণপণে হাত-পা ছুড়ছে, কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী ডাক্তার জাফর, ওকে কোলপাঁজা করে তুলে এনে খাটের উপরে চিতিয়ে ফেলল। এ সময়

---

[৩৭] স্বনির্বাচিত উপন্যাস, আলাউদ্দিন আল আজাদ, *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯৫

[৩৮] *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

জ্যোৎস্না পালাতে চেয়েছিল কিন্তু জাফরের হাতে ধারালো ছুরি।[৪২] ডাক্তার জাফর যৌনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি জ্যোৎস্নার উদ্দেশে বলেন :

> জ্যোৎস্না ভীরু কপোতির মতো, পৈথানের দিকে নিচে নেমে দাঁড়ালে উনি আবার বললেন, সব কাপড় খুলে ফেলে দাও–আমি তোমাকে দেখবো। সব কাপড় খোলো, খোলো জলদি।[৪৩]

প্রবল যৌনসঙ্গমের বর্ণনা ইঙ্গিতময় ভাষা সংযোগে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক।

> তখনো বাতাস ও বৃষ্টির অবিরাম শব্দ। জ্যোৎস্না প্রতিরোধের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।[৪৪]

বাবার চিকিৎসার পর জ্যোৎস্নার আত্মোপলব্ধি–

> জানিস সালমা? অতীতটা আমার কাছে ভস্মস্তূপ মাত্র। অতীতে কত কিছুই ঘটেছে, সেসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।[৪৫]

জ্যোৎস্নার উপলব্ধিতে ফুটে উঠেছে অতীতচারিতা।

> জ্যোৎস্না তেমনিভাবে বলে চলল, রীতিমতো শিক্ষিত ভদ্রলোক, যেই দেখত সম্মান করত : সেই প্রবীণ লোকটা সুযোগ পেয়ে আমাকে রেপ্ করল। আমি না হয় লোভনীয় ছিলাম আর সে ভুখা; কিন্তু সংযম বলে কিছু থাকবে না? মানুষ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছি সালমা, তুই বিশ্বাস কর আমি আর কোন পুরুষকেই বিশ্বাস করি না।[৪৬]

সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র নিয়ে জ্যোৎস্নার ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে :

> এ সমাজটা ভুয়ো, রাষ্ট্রব্যবস্থা আরও বেশি। এখানে কারুর নিরাপত্তা নেই, নারীর ত নেই-ই।[৪৭]

জ্যোৎস্নার মা উলফথ বানু ঘটক আফতাব সরকারের সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে জ্যোৎস্নার দৃঢ়চেতা মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

> যখন একেবারে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যাওয়ার জোগাড়, একদিন বাইরে থেকে একটা শিশি নিয়ে ফিরছিল। মায়ের বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে একটা পা দোলাতে দোলাতে, ওটা দেখিয়ে বলেছিল, মা দ্যাখ তো এটা কি? উলফত বানু ঘুরে তাকালেন, উত্তর দিলেন, কি আর একটা শিশি। ওটাতে ওডিকোলন নাকি? না মা, এর মধ্যে পটাশিয়াম সায়েনাইড। জ্যোৎস্না নিস্পৃহদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি বুঝলে না তো? বুঝবে ক্যামন করে, মাত্র মাইনর পাস, তাও গ্রামের স্কুল থেকে। আদিখ্যিতা করিস্নে কি কইবি ক। পটাশিয়াম সায়েনাইড যদিও

---

৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

রাসায়নিক পদার্থ, এক প্রকার মারাত্মক পয়জন, বিষ। জ্যোৎস্না এবার গ্রীবা তুলে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে গুরুতর ভঙ্গিতে বলল, বিয়েশাদি নিয়ে তোমরা যদি আর এক পা এগোও তাহলে পয়জন খেয়ে আমি আত্মহত্যা করবো।[৪৮]

জ্যোৎস্নার উপন্যাসিক হবার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসিক এ প্রসঙ্গে অন্যদের নারী চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছেন। নারীর মনস্তত্ত্ব প্রকাশে এটি তাৎপর্যবাহী।

শুনুন তবে আমার সবচেয়ে বড় গোপন বাসনা। একটি উপন্যাস রচনা, বলতে পারেন আমেরিকান নভেল গন উইথ দি উইন্ডের মত। কয়েকটি জেনারেশনের ইতিহাস তাতে থাকবে বটে কিন্তু তার কেন্দ্রীয় চরিত্র হবে বাংলার একজন নারী। সে সর্বদা বর্তমান। সে চিরন্তন। কিন্তু এযাবৎ বঙ্কিম, তারাশঙ্কর, মানিক, নজরুল কেউ তাকে রূপ দিতে পারেনি।[৪৯]

জ্যোৎস্না চরিত্রের মধ্যদিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রতি যৌনাবেগের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোৎস্নাকে নিয়মিতভাবে কোনো না কোনো জায়গায় শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়েছে। বাল্যপ্রেমিক আহসান সম্পর্কে জ্যোৎস্নার বর্ণনা–

সেদিন বিকেলে একটা বই আনতে ওর রুমে ঢুকলাম, আশেপাশে কেউ ছিলো না। খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে টানতে টানতে বিছানায় নিয়ে গেল। আমি তো অবাক। জ্যোৎস্না বলতে লাগলো, এরকম আর কোনদিন করেনি। পাছড়াপাছড়ি করতে করতে শাড়ি পেটিকোট উল্টে ফেলে, থর্ থর্ কাঁপছে আর বলছে, কিছ্ছু করবো না লক্ষ্মীটি, কিছ্ছু করবো না, খালি একটু দেখবো। আমার বন্ধুরা সবাই দেখেছে। জ্যোৎস্না বলল, আমি চিৎকার করছিলাম না, কেউ জানলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।[৫০]

স্বাধীনচেতা জ্যোৎস্নার জীবনের লক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোৎস্নার স্বপ্ন দৃঢ়চেতা পুরুষের–

আমি একটা স্বপ্ন দেখি। যেন সুদৃঢ় আদিম চৈতন্য লোকের একটি দৃশ্য। আমি স্বপ্ন দেখি একজন পুরুষের, যে বলিষ্ঠ ও গম্ভীর। প্রায় দেবতার মতো; কিন্তু দেবতা নয়। তাকে পেলে আমি আমার চরিত্র বিসর্জন করবো।

আমার গর্ভে আমি তার একটি সন্তান ধারণ করতে চাই যে একদিন ভূমিষ্ঠ হবে এবং বড় হয়ে পৃথিবীর চেহারাটাকে পাল্টে দেয়ার জন্য অভিযানে বেরুবে। যেমন বেরিয়েছিল হারকিউলিস।[৫১]

ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* উপন্যাসে। নর-নারীর সম্পর্কের বাইরে গিয়ে নারীর প্রতি নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। জ্যোৎস্নার হোস্টেলের

---

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১২

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

ফেরদৌস আপার প্রবল যৌনসম্ভোগের শিকার হয়েছে জ্যোৎস্না। নবীনবরণ অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত প্রফেসর লজিক আপা ফেরদৌস আরা মাহমুদ। উনি ডিভোর্সি। জ্যোৎস্না রিহার্সাল সেরে রুমে ফিরতে না পেরে ইডেনের হোস্টেলে ফিরে আসেন লজিক আপার সাথে। রাতে আপার যৌনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে–

> ফেরদৌস আপা ঘুরে দাঁড়ালেন এবং লঘুপায়ে কাছে এসে দুকাঁধে ধরলেন সামনাসামনি, দুচোখের ভিতরে গভীর চাহনি। আবেগে যেন কেঁপে কেঁপে বলতে থাকেন, আজ তোমাকে পেয়ে জ্যোৎস্না, তোমাকে পেয়ে যে কি খুশি হয়েছি, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তুমি অপরূপা, এক স্বপ্নকন্যা। আমি মরেছিলাম, মরে গিয়েছিলাম। তোমাকে বুকে জড়িয়ে জীবন ফিরে পেলাম।[৫২]

জ্যোৎস্নাকে কাছে পেয়ে ফেরদৌস আরার যৌনচেতনা জেগে ওঠে। জ্যোৎস্না অনুভব করে মধ্যরাতে ফেরদৌস আরা জ্যোৎস্নার উপরে উঠে যৌনসম্ভোগে লিপ্ত। জ্যোৎস্না অনুভব করে–

> এক সময়, শরীরে অনবরত ঠেলা লাগতে থাকলে, চট করে ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তখনো কিছুটা অর্ধচেতন। কিন্তু অবিলম্বে অনুভব, একজন তার উপরে চেপে বসে আছে। আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো নড়েচড়ে ওঠে, গলার ভিতর থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে আসতে চায়; কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। তার নবোদ্ভিন্ন সুঠাম দুই স্তন আঁকড়ে ধরেছিল; সেখান থেকে সরে মুখে একটা হাত চেপে ধরেছে। তারপর গোটা দেহটাই নেমে আসে। ওর দুটোর উপরে আরও দুটো গোলগাল মাংসল সম্ভার। এখন বুঝতে বাকি রইল না, কিন্তু কানের কাছে তখন ফিসফিস ধ্বনি, জ্যোৎস্না, প্রিয়া আমার! আমি পারভারটেড, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ো না। ঘৃণা করলে আমি মরে যাবো। অন্ধকার, এবং অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিমালার অতলে থেকেও রাগে দুঃখে আতঙ্কে ওর কণ্ঠরোধ হয়েছিল, কোনক্রমে উচ্চারণ করল, আপা![৫৩]

নারীর জটিল মনস্তত্ত্বের যে বিচিত্র বর্ণনা তা এ উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে–

> যে কোন একজন নারীর মনস্তত্ত্ব বিচিত্রমুখী ও জটিল, তারমধ্যে জোয়ার ভাটাও আছে। আকর্ষণে একনিষ্ঠতা তার প্রকৃতিবিরোধী। একজনকে ধরে সে ঝুলে থাকে তার বাস্তব প্রয়োজনে।[৫৪]

পুরুষের যৌন-উন্মাদনা লক্ষ করেছে জ্যোৎস্না ডাক্তার জি আলী কর্তৃক–

> খপ করে হাতটি ধরে টানতে টানতে বললেন, চল উপরে। দেখবে এক আজব খেলা, একটা শক্ত দণ্ডের মাথায় পেট লাগাতেই দেখবে তুমি চর্কির মতো ঘুরছো। তৃতীয় নয়ন খুলে যাবে, তখন তুমি বেহেশ্‌ত দোজখ দেখছো।[৫৫]

---

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

প্রফেসর জি আলীর বাসা থেকে পালিয়ে এসে জ্যোৎস্না আবিষ্কার করে তার মা উলফত বানু ও ডাক্তার জাফর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত।

> এ যেন তার জন্মদাত্রী মা উলফত বানু নয় অন্য কোন নারী, উৎফুল্ল উদ্দীপ্ত আরক্তিম, শিথিল বসনে মাথার চুল নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আর জাফর চৌকির ধারে বসে কোলের উপরে তাকে আড়াআড়িভাবে জাবড়ে ধরে উপর্যুপরি চুমু খাচ্ছেন।[৫৬]

মায়ের সঙ্গে জাফরের যৌনসঙ্গম দেখে নিজেকে সামলাতে না পেরে জ্যোৎস্না আহসানের বাড়িতে গিয়ে আহসানের উষ্ণ ভালোবাসা প্রত্যাশা করলেও সে ফেরত এসেছে ভালোবাসাহীনতায়। উপন্যাসের শেষাংশে আহসান ও ডাক্তার করিমের উপস্থিতি প্রেম ও মনস্তত্ত্বের জটিল সমীকরণ ঘটনাকে পরিণতির দিকে ধাবিত করেছে। জ্যোৎস্নার উপলব্ধিতে ভালোবাসার জয় ধ্বনিত হয়েছে।

> একটা অসহায় মাকে, একটা স্বর্গীয় শিশুকে বাঁচিয়ে আমি একটা দূষিত ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করেছি। আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন।[৫৭]

জ্যোৎস্নার আত্মোপলব্ধিতে নারীর জাগরণ, প্রেম, মনস্তত্ত্ব ও সমাজের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

> ১. এতো দিন অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল এখন থেকে আমার আসল কাজ শুরু হবে। যুদ্ধ, পুরুষের লাম্পট্যের বিরুদ্ধে নারীর প্রতি তার অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।[৫৮]
>
> ২. কোন শিশুই অবৈধ হতে পারে না। সেও পবিত্র।"[৫৯]

নারীকে ভোগের পণ্য করা এবং ভালোবাসার পরিণতিতে সঙ্গমজাত সন্তান পবিত্র। ভালোবাসা কালিমাময় হলেও সন্তান পবিত্র–সে কথা উপন্যাসের শেষাংশে ধ্বনিত হয়েছে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মধ্যেই মানব জীবন এগিয়ে যায় চূড়ান্ত পরিণতির দিকে।

> জ্যোৎস্না–জ্যোৎস্না। তোমার ভাইকে আমি নষ্ট করেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম তোমাকে পাবো না। তোমাকে পাবো না বলেই দুশ্চরিত্র হয়ে গিয়েছিলাম।[৬০]

প্রেমের অপ্রাপ্তি, নবজন্ম ও পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা এ উপন্যাসের মৌল সত্য।

---

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

অনূদিত অন্ধকার

আলাউদ্দিন আল আজাদের *অনূদিত অন্ধকার* উপন্যাসে মিতুনকে নিয়ে লিংকনের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের নানামাত্রিক সংকট, জটিলতা, নৈঃসঙ্গ্য ও মানসিক দোলাচলবৃত্তি সহযোগে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানবিকতার জয় সূচিত হয়েছে। *অনূদিত অন্ধকার* উপন্যাসে মনোজাগতিক অন্তর্বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। কাহিনির শক্ত অন্তর্বুনটের প্রযত্নে লালিত ঘটনাংশ প্রেম ও মানবিকতার পথে অগ্রসরমান, সে চিহ্ন উৎকীর্ণ রয়েছে উপন্যাসের বয়ন কৌশলে।

> যতক্ষণ আলো আছে, ততক্ষণ আলো। আমি শয়নকক্ষে এসে দাঁড়ালাম। দেয়ালে টাঙানো মিতুনের ছবি। মিতুন, হ্যাঁ মিতুন। কাগজী নাম রুখসানা আহমদ। মিতুন ছিল ওর ডাকনাম। আমার সঙ্গে যখন পরিচয় তখন ওকে সবাই ডাকত সিস্টার মিতুন। লক্ষ্য করেছিলাম, ওই ডাকে আদর ঝরে পড়ত, ফুটে উঠত সোহাগ, ভালোবাসা।[৬১]

অনূদিত অন্ধকার উপন্যাসের কথক লিংকন। অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সিস্টার মিতুনের সঙ্গে লিংকনের পরিচয় এবং ডাক্তার আশরাফের সহায়তায় লিংকনের সঙ্গে মিতুনের বিয়ে হয়েছিল। উপন্যাসের ঘটনাংশের বিস্তার লিংকন মিতুনের প্রেম ও বিয়ের ঘটনাকে নিয়ে। বিয়ের প্রথম দিকে মিতুনের বক্তব্য তাৎপর্যবাহী।

> ১. অসাধারণ মেয়ে রুখসানা কিন্তু মেজাজী। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, পিতার আদর্শ ওর ধ্রুবতারা। বিয়ের প্রথম রাতে আনন্দে আত্মহারা হয়নি সে, বরং যে কথাগুলো বলেছে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ।[৬২]

> ২. এই-বিয়ে? নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে মিতুন, তারপর সামনাসামনি। দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে গভীরস্বরে বললে, তুমি কি জানো না মিলনে প্রেমের মৃত্যু! তুমি কেন দূরে থাকতে পারলে না? আমার সহানুভূতি জাগলো, তোমার প্রতি, হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কে বলল তোমাকে এটাই কেবল সত্য? মিলনেও ভালোবাসা বাঁচতে থাকতে পারে।[৬৩]

স্বামী লিংকনের সন্তানের বাসনার বিপরীতে মিতুনের স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে পড়তে যাবার বাসনা প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বামীর উদ্দেশে মিতুনের বার্তা–

---

৬১ *অনূদিত অন্ধকার*, স্বনির্বাচিত উপন্যাস, আলাউদ্দিন আল আজাদ, পৃ. ১৭৫

৬২ হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

৬৩ *অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ১৯২-১৯৩

অলরাইট ইফ ইউ ওয়ান্ট এ চাইল্ড নাও ইউ টেক এনাদার ওয়াইফ, আই স্যাল হ্যাভ নো অবজেকশন![৬৪]

মিতুনের জটিল মনস্তত্ত্বেও প্রেমাবেগের তীব্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ডাক্তার সালাম কবিরের প্রতি, যা দেখে লিংকনের মনস্তত্ত্বে জটিলতার আভাস পেয়ে লিংকন বলেছে–

> দোহাই তোমরা মনে করো না আমি সংকীর্ণচেতা ছিলাম। কিন্তু আমার ভিতরে কি একটা জটিলতা পাকিয়ে উঠছিল, যার উপরে আমার কোন হাত ছিল না। আমি কি করবো, বারে বারে একটা মূর্তি ভেসে উঠত আমার চোখের সামনে, একজন সহাস্য স্বাস্থ্যবান যুবকের চেহারা। সে একজন চিকিৎসক।[৬৫]

লিংকনের মনে মিতুনকে হারানোর প্রশ্ন উঠতে থাকে এবং প্রিয়জন হারানোর ব্যথাও লিংকনের ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। সন্দেহের দৃষ্টি বাড়তে থাকে–

> আমি রাতে কয়েকবারই গিয়েছিলাম তোমাদের হাসপাতালে, সেই ওয়ার্ডেও যেখানে তোমার ডিউটি থাকত। তোমার স্বামী হওয়ার সুবাদে অধ্যক্ষের দেওয়া পাস আমার সহায় ছিল। কিঞ্চিত আড়ালে থেকে আমি দেখতে চাইতাম শুধু একটি দৃশ্য, সে হল, তোমরা কি করছো–তুমি এবং ডক্টর সালাম কবির। তুমি ঠিক সময়ে ফিরলে, তখন ফরসা হয়ে এসেছে। জানালার পর্দা অর্ধেক টেনে রেখেছিলাম। ওখানে গেলাম। নিজেকে অনেকটা আড়াল করে তাকালাম বাইরে। তুমি নামছো, তোমার পিছনে আরও এক ব্যক্তি যাকে আমি দেখতে পাই। এটা সৌজন্য, বিদায় দেওয়া। তুমি একটু দূরে এসে স্মিতহাস্যে হাত নেড়ে বিদায় জানালে, ওদিক থেকে একটু শব্দ গুডবাই। তুমি যথারীতি চাবিতে দরোজা খুলে ঘরে ঢুকলে, আমি করিডোর অবধি এগিয়ে গিয়ে তোমার পথ রোধ করে দাঁড়াই। চাপা চিৎকারে বললাম, দাঁড়াও! এখানেই আমার একটা কথার জবাব দিতে হবে।'[৬৬]

লিংকনের উপলব্ধিতে প্রেমের বিয়ের তাৎপর্যহীনতা প্রকাশিত হয়েছে। সালামের সঙ্গে মিতুনের প্রেমের বিপরীতে লিংকনের সঙ্গে মিতুনের শিথিল সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে। লিংকন মিতুনকে বলেছে–

> জানি তুমি জবাব দেবে না। সত্য বলার সাহস নেই তোমার। আমিই বলছি, হ্যাঁ আমিই বলছি, তুমি, তুমি আর তুমি আর সালাম। তুমি আর সালাম অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ। নাইট ডিউটি তোমার। তোমার প্রতিরাতের অভিসার–![৬৭]

লিংকনের মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে মিতুনের সঙ্গে সালামের অবৈধ সম্পর্কসহ নানা পার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহে।

> মিতুন তার ভালোবাসার ধন, একান্ত তারই, অন্য কারো নয়, হতেও পারে না, তার এ প্রগাঢ় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ সন্দেহ, কিন্তু যে জীবন সঙ্গিনী তাকে সন্দেহ করে দ্বৈতজীবন আর কতদূর এগিয়ে নেয়া যায়।[৬৮]

---

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫

৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৬৮ হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

লিংকনের আত্মোপলব্ধি–

> মিতুন তুমি আত্মহত্যার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলে, তিন দিনের দীর্ঘ সময়েও আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি। নিজের স্বার্থচিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম।[৬৯]

অভিমান-অভিযোগের তিন দিনের মাথায় আত্মহত্যা করেছে মিতুন। লিংকনের কথায়–

> তুমি নিশ্চয় ছুটে গিয়েছিলে, কিন্তু ইঞ্জিনে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েছিলে। তখন রেল লাইনের কাছে সবুজ ঘাসের উপরে শুয়ে আছ। শান্ত, খুব শান্ত। যেন গভীর ঘুমিয়ে আছো। আমি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে আছড়ে পড়লাম তোমার বুকের উপর, মিতুন, মিতুন! এ কি করলে তুমি মিতুন।[৭০]

মিতুনের মৃত্যুতে আবেগায়িত প্রেমিক লিংকনের মিতুনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তৎপর দেখা যায়।

> আমি একটা নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তার নাম হবে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল রুখসানা নার্সিং ইনস্টিটিউট।[৭১]

প্রেমিকার প্রতি তীব্রতম আবেগ প্রকাশিত হয়েছে লিংকনকে মনে। সে বলেছে–

> কিন্তু তোমার ব্যাকুলতা, তোমার অতৃপ্তি বুঝি বড় বেশি ঝটিকায়, কোন প্রার্থনা কোন দোয়া সেখানে পৌঁছাতে পারে না। ঝড়ের পাখির মতো বাড়ি খেয়ে ফিরে আসে। নিমিষে তুমি হয়ে যাও মহাঘূর্ণিঝড়, ভয়ানক জলোচ্ছ্বাস। তোমার কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে না তোমার অভিমান। ছড়িয়ে পড়ে।[৭২]

আত্মদগ্ধে পরাভূত নায়ক লিংকনের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে অনুতপ্ত সত্তার বহিঃপ্রকাশে।

> তোমার বিরুদ্ধে যে হিংস্র শক্তি আমার ভিতরে উদ্ধত মাথা তুলে জেগে উঠেছিল তার নাম কি। অনেক ভেবেছি। বিশ্লেষণও করেছি কম না। তার নাম কি ঈর্ষা নয়? বিভীষিকাময় বিশাল অজগরের মতো যার অন্ধরূপ? হ্যাঁ, আর কিছু নয়, ঈর্ষা। পুরোনো ওথেলো ঈর্ষাবেশে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তমা ডেসদোমোনাকে হত্যা করেছিলেন, আমি ঈর্ষাবশে তোমাকে হত্যা করেছি। আমি নতুন ওথেলো। আমি শান্তশিষ্ট, নির্বোধ একজন যুবক ছিলাম।[৭৩]

লিংকনের মনস্তত্ত্বের জটিল রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে যখন সে পূর্বপুরুষের মধ্যে দূষিত উন্মাদনা ছিল বলে আত্মোপলব্ধিতে বলীয়ান হয়েছে–

---

৬৯ *অনূদিত অন্ধকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

সে রক্ত অজানা দূর অতীতের মানব প্রবাহের, সে রক্ত আমার পূর্ব পুরুষদের। সে রক্ত আমার প্রপিতামহের। সে রক্ত আমার পিতার।[৭৪]

ঈর্ষার বীজ অন্বেষণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ লিংকনের পিতার যৌনচেতনার পরিচয় স্পষ্ট করেছেন। পুত্র জুলমতের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে হঠাৎ সে আবিষ্কার করে তার পিতার প্রেমময় সত্তার। নিজ শ্যালিকা নাশিদার সঙ্গে প্রেমের যে সম্পর্ক ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাশিদ, ওর দীর্ঘকালো কেশরাশি, পিঠ ছাড়িয়ে কোমরের নিচ পর্যন্ত ঝুলছিল। একি হল আমার? আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই। সে একটা বই দেখছিল, তন্ময়, আমি পিছন থেকে ওর পেটের ওপর হাত দিয়ে দু'হাতে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম।[৭৫]

কিন্তু লিংকন আবিষ্কার করে নিজ খালা নাশিদাকে না পেয়ে বাবা তার বিয়ের প্রস্তুতি লগ্নে তাকে হত্যা করেছে।

গভীর রাতে সন্তর্পণে গিয়ে ওকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। গলাটিপে শেষ করতে বেশি সময় লাগেনি।[৭৬]

লিংকনের আত্মোপলব্ধিতে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মাঝে প্রেমাবেগের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে।

সমুদ্রের পাড়ে যখন গেলাম আমরা, বালুর ভিতরে তোমার কোমল পা জোড়া ডুবিয়ে বলেছিলে, পুরুষের প্রেম তো পদ্মপত্রে নীর, একটু ঝাড়া খেলে ঝরে যায়। আমি কি জবাব দেবো খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তবু অবশেষে বললাম, আর মেয়েদের প্রেম? সে বুঝি অবাধ সাগর? কখনো নিঃশেষিত হয় না![৭৭]

'কল্পবৃক্ষ' দলের হয়ে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের লক্ষ্যে যখন ইনজেকশন দেয়ার দায়িত্ব লিংকনের নেতৃত্বে হবে তখন লিংকন বলে–

কেন এই কথাটা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, উপলব্ধি করলাম। সিষ্টার মিতুন আমার স্ত্রী ছিল।[৭৮]

লিংকন চট্টগ্রামে এসে উপলব্ধি করে নিঝ্‌ঝুম দ্বীপে যাওয়ার কথা–

জাহিদকে বললাম, নিঝ্‌ঝুম দ্বীপ কতদূর? আমি নিঝ্‌ঝুম দ্বীপে যাবো। আশেপাশে যারা ছিল সবাই তাকালো আমার মুখের দিকে, কেউ কিছু বলল না। আমিও বললাম না, শুধু নিঝ্‌ঝুম দ্বীপ নয়, আরও কোনো অজানা দ্বীপে যাবো, সেখানে তার কিংবা তার মতো কারুর যদি দেখা পাই।[৭৯]

---

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের মনের বাসনা ফ্রয়েডীয় চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। *অনূদিত অন্ধকার* উপন্যাসে লিংকন পিতৃদেবের অপকর্ম বা হত্যাতে বিচলিত হবার মুখোমুখি অবস্থায় দাঁড় করিয়ে লিংকনের শুদ্ধ সত্তার জাগরণ ঘটিয়েছেন।

> পূর্ব পুরুষের রক্তের ধারা উত্তর পুরুষে প্রবাহিত হবে এই সত্যই বাস্তবে রূপ দিলেন ঔপন্যাসিক।[৮০]

এ উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের জটিল বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে মিতুন ও লিংকনের প্রেম ও বিয়ে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় মিতুনের মৃত্যু হলেও আত্মোপলব্ধিতে লিংকন ভালোবাসার জয়গান গেয়েছে, এবং প্রেমের মহিমাকে উচ্চে স্থাপন করে মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে।

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। বাস্তবানুগ চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াসে কল্পলোকের সহযোগে মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্ত উন্মোচনে প্রয়াস পেয়েছেন আজাদ। ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি, অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রবাহ, চরিত্রের মধ্যকার অবচেতন সত্তার জাগরণসহ নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা ও সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাসে। অবচেতন সত্তার জাগরণের মধ্য দিয়ে ঘটনা বর্ণনা শুরু হয়েছে।

> অতি বেগুনি বর্ণালির অনন্ত নিবিড়তায় আঁকাবাঁকা সারবাঁধা মহীরুহ শ্রেণি পুঞ্জ পুঞ্জ সচল জোনাকীতে ঝিক্‌ঝিক করছিল যখন তার ছায়াপথে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে একটা মধুর চিকন কণ্ঠস্বর। আমি থমকে দাঁড়াই।[৮১]

নাগরিক জীবনের যন্ত্রণাময় জীবনে ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতার প্রকাশ ঘটেছে। সুজার বয়ানে উপস্থাপিত হয়েছে জীবনের চালচিত্র :

> আমার মধ্যে ক্রমেই একটা গভীর আতঙ্ক জমাট বাঁধছে, ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। মনে ছায়া ফেলে যায়, চলতে ফিরতে একটা অস্থিরতা। হঠাৎ কোন শব্দে চমকে উঠি, মুহূর্তে আনমনা হয়ে যাই। আমার মতো ঠাণ্ডা মাথার তরুণ আজকাল দেখা যায় না, অনেকেই মন্তব্য করেছেন, অথচ এমন কেন হল, তার সবটা বুঝে উঠতে পারছি না।[৮২]

---

[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

[৮০] হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৮১] প্রাগুক্ত, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪১

[৮২] প্রাগুক্ত, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪১

সুজা উপন্যাসের কথক ও নায়ক। উত্তম পুরুষের দৃষ্টিতে কাহিনির বর্ণনা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে জটিল অন্তর্বয়নে ও কৌশলের সুনিপুণ ব্যবহারে সুজা ও রুবা অর্থাৎ দিলরুবা জাহান খানমের বর্ণনা প্রধান বিষয় এ উপন্যাসে। ব্যর্থ প্রেমের পর সুজার জীবন যন্ত্রণার জটিল মনস্তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন ঔপন্যাসিক :

> হতে পারে এ আমার মনোবিকার। কিংবা অতিশয় স্পর্শকাতরতা। কিন্তু যাই হোক, আমার ভিতরের অবস্থাটা প্রকাশ হওয়া ঠিক না। শরীর খারাপ বলে তিনদিন ছুটি নিয়েছিলাম। তিনদিন কেটে গেল। কিন্তু এখনো সামাল নিতে পারিনি।[৮৩]

দিলরুবাকে অবচেতনে স্মরণ করে ফোন রিসিভার তুলে স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে সমাজকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে দিলরুবা।

> ১. আমি জিজ্ঞেস করছি মামা, তোমরা কেন আমাকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করেছো? বলো! বলো!।[৮৪]
>
> ২. একি স্বপ্ন নাকি বাস্তব? একটুখানি রেশের মতো মনে হলো এটা স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত তন্ময়তা; আমি বলতে গেলাম, না, না, রুবা। এমন কথা বলো না। আমরা তোমাকে হত্যা করতে যাবো কেন? মিছেই দোষারোপ করছো, আমাদের সংস্কৃতি, কত গভীর, কত সুন্দর।"[৮৫]

জাহানের অবচেতনে উপলব্ধি করেছে সুজা–

> এ এক অদ্ভুত অনুভব, যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি প্রহেলিকাময়। অন্ধকারে ছাওয়া কামরায় নিথর তাকিয়ে আছি, এবং মনে হল এ পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটেছে সেসব ঘটনা মোটেই ঘটেনি, টেলিফোন বাজেনি, এ কক্ষে জাহান আসেনি : সমস্ত বাড়ি জুড়ে চাঁদের নিচে নিঝ্‌ঝুম নীরবতা।[৮৬]

সুজার মনোজাগতিক উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে–

> নদীর ঝিলিমিলি স্রোত, অনেক পাখির কলকাকলি। বিরাশিতে পাশ করেছিলাম, আর এখন চুরাশি। বিষয়টা ছিল বাণিজ্যেরই চাবি; কিন্তু সে-ঘর খুঁজে পেলাম না।[৮৭]

বন্ধু মোরশেদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সুজার ব্যক্তিক উপলব্ধিতে অপ্রাপ্তি, হতাশা, ক্রোধ উঠে এসেছে।

> ১. আমার স্টোরি তোর এন্টিথিসিস। আমি বিসিএস (টি)-এর অনারেবল মেম্বার।[৮৮]
>
> ২. টি মানে টাউট। আমি বিসিএস টাউট ক্যাডারের একজন সম্মানিত সদস্য।[৮৯]

---

৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

সুজা তার বোন জাহানারার সঙ্গে মোরশেদের প্রেমের সম্পর্ক আবিষ্কার করে প্রেমপত্র খুঁজে পেয়ে–

> একটি খোলা, তিনচারটি আধখোলাও আছে। সেগুলো তুলে নিই। সব রাজুর লেখা। ইস্কুল জীবনের একটা, আর কলেজ জীবনের তিনটা, বাকিগুলো দেখলেও বোঝা যেত লিখেছিল কখন। কলেজে পড়ার সময়, শহর থেকে লেখা গ্রামে, সম্বোধন, প্রিয়তমা। আরেকটা হাতে তুলে নিলাম। খুলে দেখি লিখেছিল এখানে আসার পর। তার অংশ, না আমি রাগ করিনি। আমি বুঝেছি, কী দুরন্ত তোমার অভিমান। আমি শত অপরাধে অপরাধী। ক্ষমা চাই। কী, ক্ষমা করবে না? আমি জানি, করবে, তুমি আমার সবকিছু। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, তোমাকে আমার ঘরে তুলে নিয়ে আসবো।[৯০]

রাজুর বিয়ে ঠিক হলে জাহানারার রুমে এসব চিঠি পেয়েছিল সুজা, তাতেই স্পষ্ট হয় রাজুর সঙ্গে জাহানারার প্রেমের সম্পর্ক–

> জাহানারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছে নির্বাক, নিভৃতচারীর মতো দেখেছে বর বেশে রাজুকে আর অন্তর্দহনে পুড়ে মরেছে, সেই আগুনের শিখা বুক দিয়ে রেখেছে আগলে, দেখতে পায়নি কেউ।[৯১]

সুজার জটিল মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক লিখেছেন–

> একদিকে বন্ধু অন্যদিকে বোন, একদিকে সৃষ্টি অন্যদিকে ধ্বংস, সুজার চেতনালোক যেন জটিল জালে অবাধ্য কিন্তু তার থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই।[৯২]

রাজুর বিয়ে সম্পন্ন করে এসে সুজা রেস্ট নিচ্ছে কিন্তু তার বুকের ভেতরে বোন জাহানারার জন্য হাহাকার ঘোষিত হয়েছে। বিয়েবাড়িতে বোনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল সুজা।

> সবাই কলরব মুখরিত, কেবল আমিই ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠছিলাম একেবার। আমাদের গোটা পরিবারে দাওয়াত ছিল। জাহানও এসেছে। অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম দায়িত্বে ছিলাম। তবু আমি লক্ষ্য রাখছি ওর প্রতি। প্রথমে ছিল কন্যামঞ্চে। সেখান থেকে দেখলাম, অন্য কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে বরমঞ্চের দরোজায়। দূর থেকে দেখল রাজুকে, পোশাকে পাগড়ীতে সুন্দর সুপুরুষ। ভোজন পর্বের পরে বরকন্যাকে যখন পাশাপাশি বসানো হল, সেখানেও দেখলাম ওকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুজনের প্রতি।[৯৩]

বোন জাহানারার প্রতি ভাই সুজার যে গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে তা তাৎপর্যবাহী।

---

৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৯১ হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭৯

৯২ হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

উৎসব শেষে সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। দ্রুত কাপড় পালটে নিই; এবং বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার হৃদরোগ নেই; তবু আসলে আমি, বুকের কাছে খারাপবোধ করছিলাম। খাদ্য গ্রহণ করেছি নামমাত্র। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছিল।[৯৪]

সুজার আত্মোপলব্ধিতে বোনের প্রতি যে স্নেহ এবং দয়ার্দ্র হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে তা অতুলনীয়।

বন্ধু রাজুর বিয়ের কার্যাদি সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরেছে কিন্তু মনে এক অবচেতন জগৎ এসে ছেয়ে ফেলেছে।[৯৫]

সুজার আত্মোপলব্ধিতে বন্ধুর বেইমানি ও বোনের অন্তর্যন্ত্রণা স্পষ্টীকৃত হয়ে ফুটে উঠেছে। সুজার উপলব্ধি–

বাইরে নিবিড় অন্ধকার, অনেক রাত যেন হয়ে গেছে। তারকা খচিত গভীর অন্তরীক্ষ, আর আমি হেঁটে চলেছি বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে। অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াই। একটি সবুজ গাছের গুঁড়িতে একজন নারী, মনে হলো, যুবতী। আমি প্রশ্ন করলাম তুমি কে, এখানে? কে তুমি? পরিচয় দাও। একটি ঝংকারে মেয়েটি হেসে উঠল এবং দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার কাছাকাছি এসে প্রশ্ন করল, আমি কে? কে আমি চিনতে পারছো না? আস্ত বোকা! এইটুকু বলে ঝম্ করে একেবারে হাওয়া, কোনদিকে চলে গেল। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, ঠাহর করতে পারলাম না।[৯৬]

ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ মানব মনের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে প্রয়াসী ছিলেন। সুজার মনস্তত্ত্বের জটিল অন্তর্বয়ন কৌশলে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন আজাদ। সুজার আত্মোপলব্ধি পরিস্ফুটিত হয়েছে উপন্যাসের শেষাংশে–

তখন আমার কক্ষের দরজায় শব্দ, সুইচ টিপে একটা বাতি জ্বালিয়ে দিল। দ্রুত হেঁটে আমার বিছানার কাছে এল। মশারী তুলে বাইরে নামলাম। আমার মুখ থেকে কয়েকটা শব্দ বেরুল, জাহান! তুমি! এত রাত্রে! হ্যাঁ, আমি, জাহান, এত রাত্রে! অদ্ভুত ওর কণ্ঠস্বর। অতিচেনা অথচ চেনাও নয়। পরনে উৎসবের শাড়ি, তখনো খোলেনি : এক পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কালোচুল। সে তার হাত থেকে একগাদা ওষুধের পাতা সেন্টার টেবিলে ছড়িয়ে দিল এবং আমাকে বলল, এই নাও, তোমাকে দিলাম–সব ঘুমের ওষুধ। কি সর্বনাশ! আমি থতমত খেয়ে গেলাম, বললাম, এগুলো কেন? জাহান স্থির স্বরে বলল, হ্যাঁ এগুলো। আমি জমিয়েছিলাম। ভাবতাম, কোনদিন যদি কারো লাগে। আজ রাতে সব খেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম![৯৭]

জাহানের ভালোবাসার শেষ পরিণতি অপ্রাপ্তি হলেও আত্মহত্যা করেনি জাহান। বরং রাজুর সুখ দেখার চেষ্টা তাকে জাগ্রত রেখেছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা–

রাজু তোকে বিয়ে করেনি বলে তুই আত্মহত্যা করতিস! করতাম, কারণ তোমরাও জানো না, কেউ জানে না– সে-ই ছিল আমার সর্বস্ব, আমার প্রথম ও শেষ প্রেম, আমার ভালোবাসা। কথা বলা থামিয়ে সে নীরব হয়ে থাকে,

---

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

[৯৫] হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[৯৬] প্রাগুক্ত, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৭৬

[৯৭] প্রাগুক্ত, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৭৬

> যেন স্তব্ধতার মধ্যে মিশে যায়। অবশেষে আবার বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরলাম না। মনে হল, দূর থেকে আমি ওর সুখ দেখবো, আর সেই হবে আমার বেঁচে থাকার সুখ।[৯৮]

সুখের অন্বেষণে সদা ব্যাপৃত জাহানের আত্মোপলব্ধি শুদ্ধ সত্তায় জাগরিত হয়ে ত্যাগী মানসিকতায় রূপ নিয়েছে। মানবিক আচরণে তাঁর প্রেমিকসত্তার উদ্ভাসন ঘটেছে। সুজার সান্ত্বনায় জাহান শেষ পর্যন্ত ভালোবাসাহীন থাকলেও স্নেহময় ভ্রাতৃত্বে আশ্রয় পেয়েছে–

> নিঃশব্দে, ঝর্ ঝর্ চোখের পানি ঝরাতে থাকলে, ওকে টেনে নিয়ে আমি বুকে জড়িয়ে রাখি। আমার চোখের ভিতর থেকেও অশ্রুকণা বেরিয়ে আসতে থাকে ক্রমান্বয়ে, যার কোন অর্থ ছিল না।[৯৯]

সুজার জীবনের কাহিনি, অপ্রাপ্তি, চাকরি পাওয়ার মুহূর্ত দিয়ে উপন্যাসের বর্ণনা শুরু হলেও রাজু-জাহানারার প্রেম এবং শেষ পর্যন্ত জাহানারার মনস্তত্ত্ব ছাপিয়ে প্রেমের জয়গান ঘোষিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

[৯৯] প্রাগুক্ত, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৭৬

তৃতীয় অধ্যায়

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায়

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রসারে মনোজাগতিক বিশ্লেষণের আলোকে সাহিত্যকর্ম রচনা শুরু হয়। বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের ধারাবাহিকতায় বাংলা ছোটগল্পে মার্কসিজম, প্রকৃতি, নর-নারীর প্রেম, যৌনতা-উদ্ভূত প্রেম, জটিল মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচন বাংলা ছোটগল্পের প্রধানতম বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। উনিশ শতকের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যায় ছোটগল্প নতুন মাত্রা পেতে থাকে। বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'ভিখারিণী', 'পোষ্ট মাস্টার', 'একরাত্রি', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্পে মানব মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাস ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, জগদীশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ গল্পকার তাদের রচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদলে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, কামজ প্রেম, মানব মনস্তত্ত্বের নানা প্রান্ত আবিষ্কারে সচেতন ছিলেন। ফলে এঁদের গল্পে ফ্রয়েডীয় চেতনা সহযোগে শ্রেণিহীন সমাজ ও প্রেম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বিশ শতকের প্রথম দিকে কল্লোলীয় (১৯২৩) সাহিত্য গোষ্ঠীর আবির্ভাব, "তারা সাহিত্যে নিয়ে এলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। প্রয়োজনানুসারে দেহমিলনের বর্ণনাকে স্বীকৃতি দিলেন। তারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ফ্রয়েড এবং ইয়ুংদের দ্বারা।"[১]

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে এক অর্থবহ আলোচনার সূচনা করেন। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের সকল আচার-আচরণ পারস্পরিক সম্পর্ক ও চিন্তাভাবনা কর্মশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফ্রয়েড ব্যক্তির মানসিক বিকাশকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

ক. আদিসত্তা (Id)

খ. অহম (Ego)

গ. অধিসত্তা (Super ego)

---

[১] ড. ইবাইস আমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প : বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পরূপ*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৮৬

আদিসত্তা (Id) ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক স্তর। এটি জন্মগত। সমস্ত জৈবিক কামনা-বাসনা এ স্তরে প্রকাশ পেতে চায়। অন্যদিকে অহম (The ego) আদিসত্তার কামনা-বাসনার যথাযোগ্য বাস্তবসংগতি সাধনের জন্যই অহমের উদ্ভব। অধিসত্তা (Super ego)কে চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক আদর্শের প্রতিভূ বলা হয়। ফ্রয়েডের ব্যক্তির বিকাশের এই তত্ত্ব এবং দ্যা ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিমস-সহ অন্যান্য রচনা মানুষের মনোজগতে পরিবর্তিত ধারণার জন্ম দেয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী লেখায় মার্কস, ফ্রয়েড, দেশভাগ, নর-নারীর দাম্পত্য সংকট, প্রেম ও মনস্তত্ত্ব এসব বিষয় নিয়ে রচিত ছোটগল্পের প্রসার লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য অনুধ্যায়ী আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ ঘটেছে বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে। বিচিত্রমুখী নিরীক্ষাপ্রবণ গল্পগুলোতে নর-নারীর অবচেতন (Subconscious) সত্তার আলোকে মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানবিক প্রেমাবেগের তীব্রতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম গল্প 'জানোয়ার' (১৯৪৬) পাঠ করে বরিশালের সুদূর কামদেবপুর থেকে কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম পত্রযোগে লিখেছেন :

> লেখা ছাড়বেন না। আপনার গল্পে যে অভিজ্ঞতা, শক্তি ও সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছি তাতে আমাদের সাহিত্য ভবিষ্যতে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করবে, আমি নিঃসন্দেহ।[২]

আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি' (১৯৫০) প্রকাশকালে আজাদ ছিলেন আঠারো বছর বয়সি তরুণ। দেশবিভাগ-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এ গ্রন্থ ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে মানবীয় প্রেমের তথা নর-নারীর পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের যে উদ্ভাস ফুটিয়ে তুলেছেন পরম মমতায় যা নতুনত্ব এনেছে। প্রেম মানবের হৃদয়াবেগের অন্যতম অনুষঙ্গ। নর-নারীর প্রেমাবেগের তীব্রতা ধর্মীয় বাধা-নিষেধ কিংবা অসংস্কৃতির ঊর্ধ্বে উঠে মানবীয় প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে ফুটে উঠেছে। দেশবিভাগ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ষাটের দশকের আগে-পরে রচিত আজাদের ছোটগল্পে নর-নারীর পলায়নপর আত্মজিজ্ঞাসার অনুসরণ ঘটেছে। আজাদের গল্পের নর-নারী প্রেমাবেগের আবেগে সুমহান।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার বিজয় সূচিত হলেও পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল, ১৯৫৮-এর সামরিক শাসন জারির প্রেক্ষাপটে সমাজ জীবনে সৃজনশীল প্রতিভার প্রয়াস রুদ্ধ হয়। ফলে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের যে জীবন বোধ ও সাহিত্য ভাবনায়

---

[২] সৈয়দ আজিজুল হক, ভূমিকাংশ, *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭

প্রগতিশীলতা লালন করে যে পথ পরিক্রমা এগিয়ে চলছিল তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আলাউদ্দিন আল আজাদ মার্কসবাদ থেকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আশ্রয় নিলেন–

> ষাটের দশকে তিনি মনোগহনচারী শিল্পী : লিবিডোতাড়িত কামনা-বাসনা রূপায়ণে অধিক উৎসাহী। সময় ও সমাজের দ্বন্দ্বময়তায় লেখকদের জীবন জিজ্ঞাসারও রূপান্তর ঘটে।[৩]

আলাউদ্দিন আল আজাদের মার্কসবাদ থেকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে অভিনিবেশের সূত্র ধরে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> পরিবর্তন ঘটলো মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের। তাঁরা জীবিকার উন্নতির ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই সাহিত্যভাবনা এবং শিল্প শরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ হলেন ফ্রয়েড আশ্রয়ী, কেউবা স্বল্পভাষী, কেউবা আত্মগোপন করলেন রোমান্টিক কল্পলোকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে। মানবতাবাদী শ্রেণি অংশও আক্রান্ত কারণ অশক্ত বুর্জোয়া মানবতাবাদ যতখানি বর্ণচোরা ততখানি নিরাপদ। এঁদের অধিকাংশই হলেন আত্মরোমন্থনে তুষ্ট, কল্পলোকের জ্বলন্ত জতুগৃহে যন্ত্রণাবিদ্ধ, ক্রমবিকাশে শঙ্কাগ্রস্ত, দেহবাদী পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।[৪]

আজাদের রচনায় বিশেষত ছোটগল্পে তিনি রোমান্টিক প্রেমকে ছাড়িয়ে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে বারবার ফিরে গেছেন।

> ফ্রয়েডের লিবিডো ভাবনা তাঁর বহু গল্পে স্থান করে নিয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এসব গল্পের শৈল্পিক মান নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।[৫]

উপমহাদেশের বাংলা গল্পে প্রথম প্রেম ও যৌনতাতাড়িত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সফল প্রয়োগ ঘটনা কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা (১৯২৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পে প্রেম ও লিবিডোতাড়িত যৌনতা স্থান পায়। আজাদ তাঁর কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন–

> আমার কথাসাহিত্যে শুরুর দিকে দুটো ধারা লক্ষণীয়–এক. গণমুখী আর দুই. মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তাত্ত্বিকের উদাহরণ 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' এবং 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন।'[৬]

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে শুরু থেকেই আমরা নারী-পুরুষের প্রণয়সম্পর্কিত বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করি। তাঁর নিজের তরুণ বয়সে রচিত গল্পে প্রণয়ের এই মাধুর্য একরকম; আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ হয়েছে অন্যরকম। বাস্তব-অতিরেক প্রণয়াবেগ যেমন একটি বয়সকে আলোড়িত করে

---

৩ শিল্পী খানম, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে জীবন বোধের রূপ-রূপান্তর*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৫৬

৪ সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনা প্রবাহ ও শিল্প জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ*, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ২১

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৬ দৈনিক জনকণ্ঠ, অমর একুশে বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯, আজাদ প্রদত্ত বক্তৃতা

তেমনি আরেকটি বয়সে ইন্দ্রিয়-আবেগই মুখ্য হয়ে ওঠে। আবার সবকিছুর পরিমার্জিত পরিশীলিত সংযতমনস্ক রূপ এক পর্যায়ে আবেগকেও পরিমিতি দান করে। নরনারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের এই বিচিত্র রূপই আরাধ্য হয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পসংখ্যা এক শ চারটি, এরমধ্যে 'বৃষ্টি', 'কবি', 'এক জোড়া নীলচোখ', 'উজান তরঙ্গে', 'পাশবিক', 'পরী' এসব গল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর গল্পে নর-নারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্বের বিচিত্র রূপের রূপায়ণ ঘটেছে। এছাড়াও 'অন্ধকার সিঁড়ি', 'যখন সৈকত', 'জীবন জমিন', 'চুরি', 'ধোঁয়া', 'রত্না আমি ও একটি কুকুর' প্রভৃতি গল্পে প্রেম এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন সূত্রে যৌনতা-উদ্ভূত জটিল মানব মনস্তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

বৃষ্টি

'বৃষ্টি' (১৯৫৮) গল্পটি আমাদের সমাজের বাস্তবানুগ ঘটনার প্রতিচ্ছবি। 'এ গল্পে লেখকের উপস্থাপন কৌশল আকর্ষণীয়। অসাধারণ নির্মাণশৈলীতে বিমাতা ও সপত্নী পুত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের কাহিনি খুবই জীবনঘনিষ্ঠ, যা লিবিডোতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। গল্পের প্লট বিশ্লেষণ ও পরিণাম ব্যঞ্জনায় আছে লেখকের মুন্সিয়ানা। 'বৃষ্টি' গল্পে একদিকে প্রত্যক্ষ করা যায় গ্রামীণ ব্যবস্থায় অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, অপর দিকে দুর্বল শ্রেণির ওপর সবলের নির্মম কর্তৃত্বপরায়ণতা।'[৭]

এই গল্পটিতে ধর্মব্যবসায়ীদের ভিতরের একটি দিক যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি আবার ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের দিকও প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্পের মধ্যদিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টীকৃত হয়েছে। এই গল্পের কাহিনির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়–ষাট বছর বয়সি হাজি কলিমুল্লাহর তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে একুশ-বাইশ বছর বয়সি জোহরার সম্মতির মূলে ছিল সাতকানি জমির মালিকানা হস্তান্তর। ঘটক জোহরার মাতামহ নাতনিকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছিল : 'দু'একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দিব। এখন সম্পত্তিটা হাত করে নে।' হাজি কলিমুল্লাহর প্রথম পক্ষের তৃতীয় পুত্র খালিদ ছিল জোহরার সমবয়সি। প্রথমে নতুন মাকে আপনি সম্বোধন করাই তার জন্য ছিল কষ্টকর। এই খালেদের সঙ্গেই জোহরার সম্পর্কটি প্রণয়ে পরিণতি লাভ করে। লেখক ধর্মীয় ও সামাজিক নৈতিকতা দিয়ে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিকতার টুঁটি টিপে ধরেননি। এখানে তিনি যথার্থই সাহিত্যশিল্পীর বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন

[৭] শিল্পী খানম, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে জীবনবোধের রূপ-রূপান্তর*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৭

রেখেছেন। দুজনের সম্পর্কটি একদিনে গড়ে ওঠেনি। বছরাধিককাল সময়ের ক্যানভাসে গড়ে উঠেছে এই আখ্যান।

> নতুন মাকে পিত্রালয় থেকে আনার যে দৃশ্যপট লেখক অঙ্কন করেছেন তাতে জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে জোহরার মনের অনুচ্চারিত নানা আকাঙ্ক্ষার যে প্রকাশ ঘটানো হয়েছে তা পুরোপুরি সংযম-শৃঙ্খলে সৌন্দর্যমণ্ডিত।[৮]

উভয়েরই পরিশীলিত ও পরিমার্জিত আচরণ, অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার জন্য যন্ত্রণাবোধের অনতিসংকট প্রকাশ গল্পের জমিনকে নান্দনিক শোভাদান করেছে। গল্পে প্রবল খরার ধরণিতে বৃষ্টি নামার বিষয়টি জোহরা-খালেদের সম্পর্কের বিন্যাসে রূপকায়িত হয়েছে। বৃষ্টির পূর্বে ঝড়ের পটভূমিতেই বিন্যস্ত হয়েছে দুই তরুণ-তরুণীর জীবনাকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত ঝড়ের বাস্তবতা। কিন্তু কোথাও লেখক সীমা লঙ্ঘন করেননি আর তার সৃষ্ট চরিত্রও অনুসরণ করেছে লেখক-সত্তার অপূর্ব সংযম। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ ধর্মতান্ত্রিক মানসিকতাও এ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যঙ্গাত্মকভাবে। বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের কাছে বন্দনার বিষয়টিতে বিজ্ঞানচিন্তার অভাব দৃষ্টিগোচর হলেও তা অসততাপূর্ণ নয়। বরং বাতাসীর সন্তান ধারণের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের সংযোগ স্থাপন, সেটাকে খরার কারণ হিসেবে নির্ধারণ, তাকে ফতোয়ার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে প্রহার ও গ্রামত্যাগে বাধ্য করা, এবং সেই কারণেই বৃষ্টির আগমন ত্বরান্বিত হওয়ার কুযুক্তি স্থাপনের সমগ্র ঘটনায় ধর্মতান্ত্রিক বর্বর পশ্চাৎপদ মানসিকতার পাশাপাশি অসততা ও সম্পত্তিলোভের আকাঙ্ক্ষাও ব্যাপকভাবে সক্রিয়। যে রাতে মিথ্যা অভিযোগে বাতাসীর 'অবৈধ' সম্পর্কের বীজ ভ্রূণায়িত হয়। নিয়তির এই নির্মম পরিহাসটিই গল্পের পরিণাম অংশকে তাৎপর্যপূর্ণ ও রসমণ্ডিত করে তুলেছে।

'বৃষ্টি' গল্পে মানব মনস্তত্ত্ব ফ্রয়েডীয় লিবিডোতাড়িত যৌনতা ও ধর্মীয় ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে প্রেমের তীব্রতম আকর্ষণের জয় ঘোষিত হয়েছে।

'বৃষ্টি' গল্পে লক্ষ করি মৌলানা মহীউদ্দিন জুম্মার নামাজের বয়ানে অনাবৃষ্টির কারণ কোনো নারীর অবৈধ গর্ভবতী হওয়া বলার পর হাজী কলিমুল্লাহ চাকরানি জৈগুনকে নিয়োগ করে। হাজীকে জৈগুন বলে :

> "ওর তলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল। বাতাসির স্বামী মারা গেছে সাত আট মাস আগে জৈগুন হিসাব করে বলল, কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাঁচ মাসের!"[৯]

জৈগুন বাতাসীর স্বামী রজবালীর বেঁচে থাকাকালেও অন্য পুরুষের আনাগোনা ছিল বলে উল্লেখ করে। গজব নামার লক্ষণে জনগণ দিশেহারা। মওলানা মহিউদ্দিন ঘোষণা করলেন :

---

[৮] সৈয়দ আজিজুল হক, ভূমিকাংশ, *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৯

[৯] 'বৃষ্টি', *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ ২০১৮, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৯৬

"এই অনাবৃষ্টি কেন হলো, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে। তৌবা, আস্তাকফেরোল্লা! এই অঞ্চলে, আশেপাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাশ করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না, এদের দুররা মেরে ঠান্ডা করতে হবে।"[১০]

জুম্মার নামাজের সময় অনাবৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হওয়া বাতাসীকে শনাক্ত করে হাজী কলিমুল্লাহর বাড়ির কাজের মেয়ে জৈগুন। বাতাসীর বিরুদ্ধে শাস্তির আয়োজন করা এবং অপরপক্ষে সমবয়সি সৎ ছেলে খালেদের প্রতি সৎমা জোহরার প্রণয়াবেগ যৌনসঙ্গমের পরিণতিতে বৃষ্টি যেন প্রাণদানকারী সত্তা হিসেবে আবির্ভূত।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা, কী করবে যেন ঠিক করতে পারছে না। শরীরের লোমগুলি কাঁটা দিয়ে উঠছে, ঢিব্ ঢিব্ করছে হৃৎপিণ্ড, চিন্‌চিন্ করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ জোড়া ঝাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে? একি জন্ম না মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত রংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুড়ির রিনিঝিনি, একটি গভীর শান্ত নিঃশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খস্‌খস্। ঘ্রাণে আসছে একি আমের বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না এখানে নয়। এত সে চায় না, চাইতে পারে না। এক পা দু'পা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অনুভব করল একটা সুপুষ্ট নম্র মসৃণ হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আশ্বাসে তার হাতকে আকর্ষণ করল।[১১]

খালেদ ও জোহরার যৌনতার বর্ণনা দিয়েছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়–

তখন সমস্ত আকাশে মেঘের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্র গর্জনে একেবারে কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্ছ্বসিত শব্দের ভয়ংকর-সুন্দর রাগিণী। এভাবে কতক্ষণ চলল কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, তখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।[১২]

মনস্তত্ত্বের জটিল প্রয়োগে বাতাসীর বিচার চলাকালীন নিজের সৎ ছেলের সঙ্গে হাজী সাহেবের স্ত্রী জোহরার যৌনসঙ্গম পাঠককে আন্দোলিত করে। যদিও জোহরার সঙ্গে সৎ ছেলে খালেদের শিহরনের সূচনা আগেই হয়েছে।

নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শির্‌শির্ করে উঠল ভরা মেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহ্নির মতো ছড়িয়ে গেল।

---

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

[১১] *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমি, ২০১৮, পৃ. ১০২

[১২] *নির্বাচিত গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝির পানির ওপর দিয়ে সমুখে হাঁটতে লাগল।"[১৩]

বাতাসীর মামাতো ভাই রহিমদ্দিকে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেল না। হাজী কলিমুল্লাহর আগের পক্ষের ছেলে খালেদের সঙ্গে স্ত্রী জোহরার যৌনসঙ্গম চলল। বাড়িতে ফিরে হাজী দেখল জোহরা বৃষ্টিতে ভিজছে। হাজীর প্রশ্নের উত্তরে জোহরা যা বলল তা ইঙ্গিতবাহী।

না, সর্দি আমার কোনকালেই করে না! জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডান হাতে সরিয়ে ফোটা ফুলের মতো উজ্জ্বল মুখটা তুলে মধুর-হাসি উপচানো ঠোঁটে বলল, আপনি জানেন না? বছরের পয়লা বৃষ্টি, ভিজলে খুব ভালো, এতে যে ফসল ফলবে।[১৪]

হাজী কলিমুল্লাহ ব্যভিচারীর শাস্তি দিয়ে ফিরে এলেন এবং নিজগৃহে অসম প্রেমের বিপরীতে সুষম প্রেমের সূচনা ঘটল খালেদ-জোহরার সঙ্গমের মধ্য দিয়ে। ছোটগল্পের নামকরণ 'বৃষ্টি', যা প্রাণহীনে প্রাণ সঞ্চারিত করেছে এবং জোহরার বাধাহীন উচ্ছ্বাস যেন তারই প্রতিচ্ছবি। জোহরা বৃদ্ধ কলিমুল্লাহর প্রতি ব্যঙ্গ করায় জোহরার গুরুত্ব তাতে আরও বেড়ে যায়।

বৃষ্টি-পূর্ব ঝড়ের পটভূমিতেই বিন্যস্ত হয়েছে দুই তরুণ-তরুণীর জীবনাকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত ঝড়ের বাস্তবতা।[১৫]

সৎমাকে পিত্রালয় থেকে আনার সময় কিংবা রাতের সঙ্গম সবই অপূর্ব সংযম ও পরিমিতিবোধের বহিঃপ্রকাশ। ধর্মীয় ও সামাজিক নৈতিকতা দিয়ে খালেদ ও জোহরার প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি করেননি লেখক। সাহিত্যিক হিসেবে মানবিক বিবেচনার চরিত্র সৃজনে প্রয়াসী হয়েছেন। 'বৃষ্টি' গল্পে আজাদ নর-নারীর যৌনতার বিষয়টিকে চমৎকার এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন।

আজাদ 'বৃষ্টি' গল্পে অবদমিত চেতনার সঙ্গে প্রেমানুভূতি প্রযুক্ত করেছেন খালেদ-জোহরা সম্পর্কের মাঝে। অল্পবয়সি জোহরা স্বামীর সঙ্গে বয়সের অসম ব্যবধানে সৎ ছেলে সমবয়সি খালেদের প্রতি আসক্ত হয়েছে। ধর্মান্ধ হাজী সাহেবের পরাজয়ও ধ্বনিত হয়েছে গল্পে। ফতোয়াবাজ মৌলানার পরাজয় ধ্বনিত হয়েছে এ গল্পে। একবিংশ শতাব্দীর অধিবাসীদের মধ্যযুগীয় আচরণ তুলে ধরেছেন মৌলানা ও হাজী সাহেবের মধ্য দিয়ে। বৃষ্টি প্রাণ ও সৃজনশীলতার প্রতীক। বৃষ্টির মধ্যে জোহরা ও খালেদের মিলন ইঙ্গিতবাহী–

---

[১৩] *নির্বাচিত গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

[১৫] সৈয়দ আজিজুল হক, ভূমিকাংশ, *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১২৬

এই অসাধারণ গল্পটিতে আলাউদ্দিন আল আজাদ নর-নারীর যৌনতার বিষয়টি চমৎকার এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন।[১৬]

'বৃষ্টি' গল্পটিতে জীবনের গভীরতা অনুসন্ধান করেছেন সমালোচক :

বৃষ্টি গল্পে দুটি ঘটনা সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। বাহ্যিক সমস্যা আবহাওয়া ও জলবায়ুগত সমস্যা, অন্যটি অভ্যন্তরীণ মনোদৈহিক সমস্যা। অনাবৃষ্টিজনিত কারণে সমস্ত গ্রামে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতি, খরা ও ফসলহীনতার পাশাপাশি অন্তঃস্রোত ফল্গুধারার মতো গড়ে উঠেছে হাজী কলিমুল্লাহর তৃতীয় স্ত্রী জোহরার মনোদৈহিক শূন্যতার কথা। বৃষ্টিহীন অনাবাদী জমির মতোই জোহরার দেহের ভূমিও হয়ে ওঠে নিষ্ফলা। লেখক সমাজের নারী যে অধিকারহীন, তার চিরায়ত বঞ্চনার যে রূপ তাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন জোহরা-খালেদের লিবিডোচেতনার গভীরে।[১৭]

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'বৃষ্টি' গল্পে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এই গল্পের ফতোয়াবাজ মৌলবির সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লালসালু উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* নাটকের সঙ্গে 'বৃষ্টি' গল্পের সাযুজ্য অন্বেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

বৃষ্টি গল্পে আছে মিথ কল্পনার অনুষঙ্গ। বৃষ্টি হলো সৃষ্টি সম্ভাবনার প্রতীক। আবার মিথিক বিশ্বাস অনুযায়ী পুরাণের প্রথম নর-নারী থেকে সূচিত হয়েছে মানব প্রবাহের। সৃষ্টির সূচনালগ্নে পৃথিবী যখন বন্ধ্যা ছিল তখন আদি নর-নারীর হলকর্ষণের দ্বারা সভ্যতার সূচনা ঘটেছে। *বৃষ্টি* গল্পে খালেদ-জোহরা যেন আদি নর-নারীর প্রতিরূপ। এই *বৃষ্টি* যেমন গ্রামের কঠিন শুষ্ক মৃত্তিকায় এনেছে জীবনের আশ্বাস তেমনি জোহরার ভোগতৃপ্ত আদিম লিবিডোচেতনার পরিপূর্ণতাকে সঙ্কেতিত করেছে বৃষ্টির প্রাচুর্য।[১৮]

একবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের যুগে ধর্মীয় ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে কার্যসিদ্ধির সমাজবাস্তবতাকে আঘাত করে গল্পকার নবজীবনের জয়গান করেছেন। এবং ফতোয়াবাজির নীরব প্রতিবাদ হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদ বৃষ্টি-ঝড়ের রূপকের মাধ্যমে যৌনসঙ্গম করিয়ে উচিত জবাব দিয়েছেন। এই গল্পে মানুষের মনস্তত্ত্বের নানামাত্রিক ব্যবহার শেষে মানবীয় কাহিনির জয় হয়েছে।

কবি

'কবি' (১৯৫৯) গল্পে জীবন সংগ্রামে আজন্ম সংগ্রামরত কবি মহসিনের জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পূর্বাপর কাহিনির যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াস পেয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। গ্রামীণ পটভূমিতে লজিং মাস্টার

---

১৬ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬, পৃ. ২০৮

১৭ চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৬৩

১৮ চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৬৪

মহসিন ও তার ছাত্রী দুলির মধ্যে প্রণয় সঞ্চারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। দুলির প্রতি প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট মহসিন দুলিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়–

> মহসিন কাছে গেল ওর। আবেগ ভরা ফিস্‌ফিস্ স্বরে বলল, চল পালিয়ে যাই আমরা আজ রাত্রেই! শয়তানদের চক্রান্ত ভাঙতে হলে এ-ছাড়া উপায় নেই। বুঝেছ? রাত যখন গভীর হবে, সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তুমি সাবধানে কপাটের খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। আমরা চলে যাব দূরে বহুদূরে যেখানে এদের কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।[১৯]

শেষ পর্যন্ত দুলি আসেনি। মহসিন ব্যর্থ হয়ে দুলির বিয়ে দেখেছে। মহসিনের বর্ণনায় গল্পকার জানাচ্ছেন :

> লাল বেনারসি শাড়ির মধ্যে গোলাপ কলির মতো জড়িয়ে থাকা টিকলি, নেকলেস, চুড়ি, কানপাশা পরা দুলিকে নিজের চোখেই দেখতে হলো। এবং শুধু তাই নয়। ভাগ্যের এমনি নির্মম পরিহাস, সে ওর এজিনের সাক্ষী।[২০]

এরপর মহসিনের জীবন ছন্নছাড়া হয়ে গেল আর ভাবতে লাগল :

> বিয়ের উৎসব থেকে পালিয়ে আসার পর নদীতে একটি নৌকার পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে সারারাত ধরে যে হিজিবিজি ভাবনার বুদবুদ, ভোরের দিকে তার মধ্য থেকে একটা জ্যোর্তিময় রেখা যেন ফুটে উঠলো। ভাবলো সে কেন মরবে? আত্মহত্যা তো কাপুরুষের কাজ।[২১]

তারপর মহসিন নতুন জীবনের প্রত্যয় নিয়ে ঢাকায় চলে এলো। কিন্তু ঢাকায় কঠিন সংগ্রামশীল জীবন তাকে কাব্যচর্চার আবেগময় পথ থেকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবতার পথে। পত্রিকা হকারের জীবন বেছে নিয়ে সে লগ্ন হলো বস্তিজীবনের বাস্তবতায়। এই জীবনেই ভাবাবেগমুক্ত এক বাস্তব প্রেমময়তার সঙ্গে পরিচয় ঘটল তার।

> অশিক্ষিত হকারের অশিক্ষিত বোন জয়তুন বিবাহিতা; কিন্তু স্বামীর সমকামিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এই নারী যথার্থ প্রেমমাল্য পরিয়ে দিল মহসিনের কণ্ঠে। দুলির সঙ্গে প্রেমের ক্ষেত্রে মহসিন ছিল ভাবের ঘোরে এক স্বপ্নরাজ্যে; কবিতা লেখকের কল্পনারাজ্যে ছিল তখন তার বিচরণ। সুতরাং এই প্রেম বাস্তবায়নযোগ্য নয়।[২২]

'কবি' গল্পে সমকামিতার ইঙ্গিত রয়েছে কিন্তু তা ছাড়িয়ে প্রেমাকাঙ্ক্ষার জয় হয়েছে। জয়তুনের সঙ্গে মহসিনের যৌনসম্পর্কের জয় হয়েছে। স্বামী সমকামী ঘোষণা দিয়ে মসজিদের মুয়াজ্জিন স্বামীর কাছে যেতে চায় না জয়তুন। জয়তুন স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক তালাকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার অভয় দিলে মহসিন আনন্দিত ও নিশ্চিত হয় এবং তাদের মধ্যে প্রেমাবেগ ও যৌনতার চিত্র ফুটে ওঠে :

---

[১৯] সৈয়দ আজিজুল হক, *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১০৫

[২০] সৈয়দ আজিজুল হক, *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১০৬

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২৩

> কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে সব কিছু। মানুষের দেহ সবসময় মনের ইচ্ছায় চলে না, তাই বোধ হয়? ও অনুভব করে তার মধ্যে মিশে আছে এক পূর্ণ বিকশিত নারী! হ্যাঁ, সত্যিই এ সৃষ্টির আদিম কবিতা! আদি বিস্ময়।[২৩]

জয়তুন ও মহসিনের পথের বাধা প্রসঙ্গে জয়তুনের আশ্বাসে বিজয় ঘোষিত হয়েছে–

> হঠাৎ একটা সমস্যার যেন সহজ সরল স্পষ্ট সমাধান হয়ে গেল। গভীর গাঢ় নিঃশ্বাসের সঙ্গে একেবারে নিরুদ্বেগস্বরে শেষবারের মতো মহসিন বলল, তবে আর ভাবনা কী। তাহলে আমরা এখানেই থাকতে পারব।[২৪]

মহসিন তাই এমন প্রেমেই সার্থকতা খুঁজে পেল। লেখক মহসিনের কবিসত্তার কল্পনা-রাজ্য এবং সংগ্রামশীল বাস্তব জীবনের ব্যবধানসূত্রেই তার দ্বিবিধ প্রেমাখ্যানের ভিন্নতাকে রূপকাকারে উপস্থাপন করে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাসে মানবিকতার জয় দেখিয়েছেন।

এক জোড়া নীলচোখ

'এক জোড়া নীলচোখ' গল্পে আদিম জৈব প্রবৃত্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পঁচিশ বছর বয়সি শাহতাব একজন চিত্রশিল্পী। বন্ধুগৃহে সাময়িক অবস্থানসূত্রে দূর থেকে দেখা বন্ধুর কনিষ্ঠ বোনের এক জোড়া নীলচোখ তাকে এমনই আকৃষ্ট করে, এমনই আবেগতাড়িত করে যে তাকে পাওয়ার জন্য একপ্রকার উন্মত্ততা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সতেরো বছর বয়সি জিনাত মহলকে শাহতাব আঠারো বছর বয়সি ঝি-কন্যা আন্নির মাধ্যমে একের পর এক পত্র প্রেরণের সাহায্যে তার আবেগের সহযোগী করার প্রয়াস পায়। এবং এক সময় তার মনে হয়, সে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। লেখক শাহতাবের রূপজমোহ ও তজ্জনিত আবেগের প্রাবল্যহেতু তার মধ্যেকার উত্তেজনাকে সমগ্র গল্পে সঞ্চার করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। শাহতাবের মতোই পাঠক এবং আবেগদীপ্ত পরিণতিতে উপনীত হওয়ার জন্য একপ্রকার টানটান উত্তেজনা অনুভব করেন। এক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য হলো, তিনি এক তীব্র নাট্যিক সংবেদনার মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটান। বন্ধু জাহাঙ্গীর বাড়িতে আর্ট করার কাজে এসেছে। বন্ধুর সঙ্গে বুড়িগঙ্গার পাড়ে অঙ্কনের জন্য গেলেও শাহতাব আঁকতে পারেনি, কারণ তার দৃষ্টিজুড়ে কেবলই নীলচোখের অধিকারিণী জিনাত মহল। কিন্তু এক জোড়া নীলচোখই তার স্বপ্নভঙ্গের কারণ। শাহতাবের উক্তি :

---

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

> কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে কয়েকদিন থাকতে এসে এ কি হল! একেবারে সখাদ সলিলে ডুবে গেলাম। শুধু এক জোড়া চোখ, নীলচোখ। এক জোড়া নীলচোখ তার চাহনির যাদুতে বেঁধে আমাকে শোষণ করেছে সারাক্ষণ।[২৫]

জিনাতকে লেখা চিঠিতে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে যৌনতার প্রকাশ স্পষ্ট হয় :

> তুমি কি নিজেকে দেখেছ কোনোদিন? যদি না দেখে থাক, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, অনেক রাত্তিরে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াও তুমি–নগ্ন হও, যত বস্ত্র একে একে লুটিয়ে পড়ুক পদতলে। তুমি এখন ভেনাসের মর্মর মূর্তির মতো। দেখো তোমার অঙ্গে অঙ্গে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে, উপচে পড়ছে আগুনের মতো। কামনার সাত রং। তবু এ তো ঘুমন্ত স্বর্গ।[২৬]

প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কামজ প্রভাবে শাহতাবের মনস্তত্ত্বের জটিল পরীক্ষা আসে যখন তার লেখা চিঠি গৃহপরিচারিকা আন্নি নিজের কাছে রেখে দেয় এবং নিজেই উত্তর দেয়। জিনাত মহলকে লেখা চিঠি পেয়ে জিনাতের বদলে আন্নি আসে গভীর রাতে শাহতাবের সঙ্গে দেখা করতে। দুজন দুজনকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল। কিন্তু যৌবনা নারীর সঙ্গে শাহতাবের দেহ মিশে যেতে যেতে শাহতাব হঠাৎ জিনাতের বদলে আন্নির মুখ আবিষ্কার করে।

শাহতাব ও জিনাত মহলের রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেই প্রেমে পড়ে যায় আন্নি। রাতের অন্ধকারে যৌনসঙ্গমের এক পর্যায়ে আন্নির মুখ আবিষ্কার ও আন্নির কান্নার প্রসঙ্গ গল্পে নাটকীয়তা তৈরি করেছে। গল্পটি কল্পনাপ্রসূত হলেও যৌনাবেগের সংগঠনে সার্থক হয়েছে।

> আন্নি! এ তুমি কী করলে আন্নি! সবকিছু নষ্ট করে দিলে। আন্নি কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর অশ্রুজলে ভিজে গেছে বুক। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতেই ও সেগুলো আরো চেপে ধরলো। বলল, রাখো, এমনি ছেড়ে দিও না। সকাল হওয়ার তো আরও অনেক দেরি! আমার চিঠিগুলি মহলকে দাওনি। তুমি আন্নি? না। আমার শিথিল হাতের পাতাটা নিজের হাতে বোলাতে বোলাতে ও বলল, আমিই সেগুলি রেখেছি এবং জবাব লিখেছি। সেগুলি কি আমার হতে পারতো না?[২৭]

শাহতাব এ প্রশ্নের উত্তরে নিরুত্তাপ। গল্পটি রূপজ মোহকামে পর্যবসিত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে বাস্তবতায়। এ গল্পটিকে মানব-মনের বিচিত্র অনুভবের রঙে রঞ্জিত করে চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করেছেন গল্পকার।

---

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[২৭] *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১২১

উজান তরঙ্গে

'উজান তরঙ্গে' (১৯৫৯) আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রেম ও ভালোবাসার গল্প। মেঘনার তীরবর্তী জীবনে জুলমত মাঝির জীবনের মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে। নদী-তীরবর্তী জেলে জীবনের কাহিনি নিয়ে রচিত 'গঙ্গা', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'সারেং বৌ', এসব বিখ্যাত উপন্যাসের ভাবাবেগও এ গল্পের সুষম বিন্যাসে উপস্থিত। স্বল্প আয়তনের কাহিনির মধ্য দিয়ে বৃহৎ কল্পিত ক্যানভাস সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এই গল্পের আখ্যান ভৈরবের নিকটবর্তী মেঘনা-তীরবর্তী এক গ্রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

'উজান তরঙ্গে' গল্পে দেশবিভাগ ও দাঙ্গার ফলে দেশত্যাগকারী পরিবার রক্ষা পেলেও যমুনার মতো যেসব পরিবার থেকে গেছে তাদের উপর নির্যাতনের কথা যেমন আছে আবার জুলমত ও যমুনার প্রেম ও যৌনাকর্ষণের বর্ণনা তেমনি রয়েছে। ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে 'উজান তরঙ্গে' গল্পে গল্পকার জুলমতের সঙ্গে যমুনার প্রণয় উপস্থাপিত করেছেন মমতার সঙ্গে। যমুনার প্রতি কামজ প্রভাবে প্রেমভাব জাগ্রত হয়েছিল জুলমতের। নৌকায় ওঠার আগের মুহূর্তে যমুনার শাড়ি উঠানো দেখে জুলমতের হৃদয়ে প্রেমাবেগ যৌনতা-সংযোগে কামজ বিষয় রূপায়িত হয়েছে :

> শাড়িটা গোড়ালির কাছ পর্যন্ত তুলে যমুনা নৌকার কাছে যায়। জুলমত তখনো নিচে, আবরণমুক্ত আবছা পা দু'টো দেখে হৃৎপিণ্ড ঢিবঢিব করে উঠল ওর। কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে জিগ্‌গেস করল, উঠতে পারবা তো? আমার হাতটা ধর।[২৮]

কিন্তু সামাজিক কারণে সেই প্রণয় দাম্পত্য পরিণতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। জুলমত মাঝিগিরি করে, নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক আবেষ্টনে বৈবাহিক জীবনে লগ্ন হয়ে তিন সন্তানের জনক হওয়ার পর বিপত্নীক হয়। এরমধ্যে যমুনারও বিয়ে হয় আপন সম্প্রদায়েরই আবর্তনের মধ্যে। কিন্তু একদা ভিন্ন পুরুষের বল প্রয়োগের শিকার হলে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার আশ্রয় ঘটে বারবনিতালয়ে। কিন্তু জুলমতের কাছে সে কখনো পরিত্যক্তা বলে বিবেচিত হয় না। তার প্রতি প্রণয়বশত সাক্ষাতের জন্য বারবনিতালয়ে যেতেও অনাগ্রহী হয় না এবং বিপত্নীক হওয়ার পর তাকে নিয়ে সংসার বাঁধার পরিকল্পনা নিয়ে যমুনাকে সে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে অনড় থাকে। এমনই এক পরিস্থিতিতে আসে যমুনার পিতার মুমূর্ষুকাল। বারবনিতালয়ে যাওয়ার পর যে পিতা যমুনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তার মৃত্যু মুহূর্তে একমাত্র কন্যার উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন বিবেচনা করে জুলমত যমুনাকে আনার ব্যবস্থা করে।

> গল্পের কাহিনী এই বিষাদাত্মক ও বিয়োগাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মিলনাত্মক পরিণতি অর্জন করে।[২৯]

---

[২৮] সৈয়দ আজিজুল হক, *নির্বাচিত গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

লেখক নাট্যিক সংবেদনী অব্যাহত রেখে এক পরিশীলিত ও পরিমার্জিত আচরণ সহযোগে জুলমত যমুনার প্রণয়াবেগকে চিত্রিত করেছেন।

> নিজ জীবনের কোনো ভুল নয়, বহির্ঘটনার চাপে যাকে স্বামী ও পিতা দুজনকেই হারাতে হয়েছে, একমাত্র সন্তান হয়েও যাকে পিতার ঘৃণা সহ্য করতে হয়েছে, পিতার মৃত্যুর মুহূর্তেও তার আবেগ নয় কম্পিত কিংবা বিপর্যস্ত।[৩০]

সেই পিতাকে হারিয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য, শোকে মুহ্যমান, নিদ্রাক্লান্ত যমুনাকেই জুলমত সবচেয়ে আপন করে, পরম মমতা ও ঘনিষ্ঠ শারীরিক নিবিড়তায় লাভ করে। কিন্তু জুলমত লক্ষ করে, যমুনাকে ঘিরে সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষার এমন পরিণতিতে জাগ্রত নয় তার ইন্দ্রিয়। পিতৃহারা নারীর প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শনে–

> লেখক ও তার সৃষ্ট চরিত্রের সংযম যেমন বাস্তবমণ্ডিত তেমনি শিল্পসম্মত। যমুনাও জুলমতের এমন আচরণে সন্তুষ্ট ও তার প্রতি অনুকূল হয়ে প্রণয়ের প্রতিদান প্রদানে উন্মুখ। জুলমতের প্রণয়ের প্রগাঢ়তায় যমুনা তার স্ত্রী হতে, সন্তানদের দায়িত্ব নিতে অবশেষে সম্মত হয়।[৩১]

'উজান তরঙ্গে' আজাদের নদীকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকার চিত্রসংবলিত গল্প। জুলমত নৌকা চালায়। টুনটুনি নামে তার সাথি এক মেয়ে ও ছোট দুটি ছেলে। নৌকায় আরোহণ করার মুহূর্তে যমুনার প্রতি জুলমতের যৌনচেতনা স্পষ্ট হয়েছে। প্রেমজ মোহ লিবিডোচেতনা সহযোগে সফলতা পেয়েছে। জুলমতের মধ্যে প্রেমচেতনা জাগ্রত হয়েছে :

> কোমল অঙ্গের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে পেশিগুলো যেন ফুলে ওঠে আরো, নাকে এসে লাগছে সুবাসিত তেলমাখা চুলের গন্ধ। এখন বেসামাল হওয়া ঠিক নয়। প্রায় কোলপাঁজা করে ওকে তুলে দিয়ে এক ঠেলায় নাওটা ভাসিয়ে দিল জুলমত। রক্তে দারুণ উষ্ণতা।[৩২]

যমুনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল জুলমত। বাবার দাহকার্য সম্পন্ন হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে যমুনাকে নিয়ে যাত্রা করে জুলমত। মনের মধ্যে জুলমতের নানান ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। শেষাবধি পঞ্চাশের দাঙ্গার পর মানবধর্মে বলীয়ান হয়ে যমুনাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশে উজানে পাড়ি জমায় জুলমত। যমুনা বলে–

> যদি দরকার হয় তুমি আমারে নিয়া যাইতে পারবা অনেকদূর? হ। বেশ তাহলে ঘর ঠিক করগা। তিনদিন পরে রাত্রে আমার কাছে যাইও।[৩৩]

---

২৯ প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ. ২১

৩০ প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ. ২১

৩১ প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ. ২২

৩২ *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, পৃ. ১২৩

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

যমুনাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর জুলমতের ধর্ম ইসলাম হলেও মানবিকতায় ধর্ম বাধা হয়ে ওঠেনি। আজাদ লিখেছেন :

> এখন আবার থইথই করছে মেঘনা, ধারালো হাওয়ায় ঢেউয়ের মিছিল, গ্রামের দিকে ফিরতি যাত্রার বৈঠা বাইতে একেকবার ফুলে ফুলে উঠছে হাত-পায়ের পেশিগুলো, মুখ দিয়ে যেন ছুটবে ফেনা। কিন্তু তবু জুলমত এতটুকু ক্লান্ত নয়। প্রয়োজন হলে উজান ঠেলে ঠেলে তাকে যেতে হবে আরও অনেকদূর। হয়তো পাহাড়ের কাছে বা জঙ্গলের ধারে, অথবা নতুন কোনো জনপদ পর্যন্ত। কিংবা হয়তো আরও দূরে, অন্য কোথাও।[৩৪]

জুলমত ও যমুনার প্রেম ও তাদের মনোজগৎকে বিশ্লেষণ করেছেন যথার্থভাবে। আলাউদ্দিন আল আজাদ ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেও গ্রামীণ আবহে নিম্নবর্গের মাঝে সংস্কারহীন যে যৌনসঙ্গমজাত প্রণয় তার পরিচয় অন্যান্য গল্পের মতো এখানেও উপস্থিত। গ্রামীণ অশিক্ষিত মানুষের এমন স্নিগ্ধ সংযতমনস্ক প্রণয়কাহিনি রচনা করে লেখক নিজেও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক প্রেমের সূচনা করেছেন।

পাশবিক

'পাশবিক' (এপ্রিল ১৯৬০) গল্পে বিবৃত হয়েছে ডাকাতদল কর্তৃক অপহৃত এক সুন্দরী ব্যবসায়ী কন্যার এবং ডাকাত-সর্দার কুতুবের ব্যতিক্রমধর্মী মনস্তত্ত্ব। ব্যবসায়ী কন্যা জয়নাবের একটি অবজ্ঞামূলক আচরণ ডাকাতদলের কাছে গর্হিত বিবেচিত হলে তারা রাত্রির অন্ধকারে তাকে অপহরণ করে। এরূপ নারী অপহরণের ফল যা হয় ডাকাতদল কর্তৃক ওই নারীর ওপর শারীরিক পীড়নের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ। কিন্তু জয়নাবের ক্ষেত্রে ঘটল ভিন্ন ঘটনা। অপহরণের ধকলে ঘুমে বিভোর হাত-পা-মুখ বাঁধা জয়নাবকে যখন ডাকাত-সর্দার কুতুবের কাছে প্রথম ভোগের জন্য উপস্থাপন করা হলো তখন বিকটদর্শন এগারো খুনের আসামি কুতুব এই নারীর রূপদর্শনে বিমোহিত হলো। বাঁধন খুলে আদর-সোহাগে যখন তার ঘুম ভাঙানো হলো তখন ডাকাত-সর্দার কুতুবের পরিচয় পেয়ে এবং তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে জয়নাব প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে কৌশল নিল আত্মসমর্পণের। আর এতেই জয়ী হলো সে। এমন আত্মসমর্পণ কুতুবের পাশবিক সত্তাকে নিস্তেজ করে তার মানবিক সত্তার উজ্জীবনে সাহায্য করল। কুতুবের মধ্যে সূচিত হলো এক ইতিবাচক পরিবর্তন। তার মধ্যে ঘটল প্রেমবোধের জাগরণ। ফলে ডাকাতদলের অন্যরা যখন শিকারভোগের জন্য উগ্রচাঞ্চল্যে অধীর হয়ে উঠল তখন তাদের প্রতিরোধেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে কুতুব জয়নাবকে রক্ষা করল। বিনিময়ে মারাত্মকভাবে জখম হলো সে। নাটকীয়ভাবে রঙ্গমঞ্চে পুলিশের

---

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

প্রবেশ ঘটায় জয়নাবসহ ধৃত হলো আহত কুতুব। মানব মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাসে যৌনতার অনুভবে উদ্দীপিত হয়ে জয়নাব পুলিশের কাছে কুতুব ডাকাতের ধর্ষণের কথা অস্বীকার করেছে :

> টেবিলে দু'তিনবার হাতুড়ি পিটে জজ সাহেব ওকে শনাক্ত করতে বললে, জয়নাব কাতরিয়ে ওঠার মতো করে উচ্চারণ করলো, না না হুজুর, এরে তো আমি দেহি নাই! অন্য লোক আছিল।[৩৫]

এ সময় কুতুব বলে উঠল :

> আন্ধার রাইত কিনা, ও আমারে ঠিক চিনতে পারে নাই জজ সাহেব। আমি আছলাম। আমাকে যা ইচ্ছা সাজা দ্যান।"[৩৬]

এভাবেই এই গল্পে কুতুব ডাকাত ও জয়নাবের সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এ গল্পে প্রেম মনস্তত্ত্বের আরেক উন্মোচন আমরা লক্ষ করি জয়নাবের মধ্যে। দস্যুসর্দার কুতুবের বিচারানুষ্ঠানে আদালতের বিচারক যখন জয়নাবের সাক্ষ্য গ্রহণ করছে তখন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে জয়নাব অস্বীকার করল কুতুবের দোষ। আইনজীবী ও বিচারকসহ সকলে বিস্মিত হলো তার এমন সাক্ষ্যে।[৩৭]

'পাশবিক' গল্পটা জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবহে লেখা। কুতুবের সাত বছরের জেল-জীবনের সমাপ্তি দিয়ে গল্পটার যবনিকাপাত ঘটেছে। নৌকায় দেহপসারিণীদের ব্যবসা করার বিষয় এখানে উপস্থাপিত হয়েছে কুতুবের আক্ষেপে :

> ঘুমন্ত স্বামীর বুকের কাছ থেকে তার বৌকে তুলে এনে মউজ করার মতো বাহাদুরী আর কী আছে? এও ঠিক অতর্কিতে বুকে ছুরি বসিয়ে খুন করারই শামিল, হাত-পা ছোড়া চিৎকার, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটার মত![৩৮]

জয়নাবের সঙ্গে কুতুবের কথোপকথনের মধ্যে যৌনাবেগ প্রসারিত একপাক্ষিকভাবে :

> জয়নাব অঙ্গে অঙ্গে খসখসে হাতের স্পর্শ পেয়ে পাশ ফিরতে গিয়ে উঠে বসে একবার। দেখে পেশিবহুল ষণ্ডামার্কা লোকটা। তবু একটুও ভড়কে না গিয়ে ঘুম ঘুম চোখ দুটো মেলে ধীরে তেমনি নির্বিকারভাবে শুধাল, তুমি ক্যাডা? কুতুব ডাকাত থতমত খেয়ে যায় হঠাৎ, এ যে একদম অচিন্তনীয়। তাকে এক নজর দেখলে মেয়েরা যেখানে আর্তচিৎকার করে ওঠে, সেখানে এ কিনা কুশল প্রশ্ন জিগ্‌গেস করছে। সাহস তো কম নয়! কিন্তু আসলে সে কিছুই ভাবছিল না, কেবল তার অপলক দৃষ্টি জাদুভরা চোখের বাঁধনে আটকা পড়ে ছিল। ঠোঁট দুটো নড়ল একটু, আমি? আমি কুতুব।–কুতুব ডাকাত? তাইতো কই, আর কার এমুন কইলজা আছে? কিল্লাইগ্যা আমারে

---

[৩৫] *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫০

[৩৬] *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫০

[৩৭] সৈয়দ আজিজুল হক, ভূমিকাংশ, *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৩

[৩৮] 'পাশবিক', *নির্বাচিত গল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, পৃ. ১৪৫

> ধইরা আনছো তুমি? ও বুঝজি, বেশ এই নাও। বলে সে জামাকাপড় খুলতে থাকে। কুতুব একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সে যেন কাঁপছে ভেতরে ভেতরে।"[৩৯]

'পাশবিক' গল্পে কুতুব ডাকাতের সঙ্গে জয়নাবের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট থেকেছেন আজাদ। সমালোচক আজাদের 'পাশবিক' গল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'পাশবিক' গল্পে আজাদ নিম্নবর্গের এক ডাকাতের জৈবিক সত্তার বিচিত্রময়তার শিল্পরূপ দিয়েছেন। কুতুব নামের এক দুর্ধর্ষ ডাকাতের পাশবিক হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতার কাহিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখুর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভিখু চরিত্রের মতই মেঘনা পাড়ের কুতুবের নারী ও অর্থের প্রতি প্রবল বাসনা।[৪০]

সবশেষে এই গল্পে লক্ষ করা যায় দস্যুতামুক্ত হয়ে জয়নাব বা তার মতো কোনো নারীর সঙ্গে দাম্পত্য বন্ধনে লগ্ন হয়ে সংসার জীবন নির্বাহের এক স্বপ্নে তখন সে বিভোর। কারামুক্তিতে যদি সাত বছর কেটেও যায় তাতেও সে অখুশি নয়। এক নতুন প্রেমচেতনা তার মতো দস্যুকে উন্নীত করেছে শুদ্ধসত্তায়। কুতুব ও জয়নাব উভয় চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে লেখক এখানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

পরী

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'পরী' (জুন ১৯৬০) গল্পে মাতবর ও গৃহপরিচারিকার অসম শ্রেণি বিচার, বয়স বিচারসহ অসম সংস্কৃতির মধ্যে একটি সম্পর্ক শুরু ও শেষের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। এই গল্পে ধনু মোল্লা নামক বৃদ্ধের বাড়ির কাজের ঝি পরীর প্রতি যৌনাবেগের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামের মাতবর ধনু মোল্লার সম্পদে আকৃষ্ট হয়েছে পরী কিন্তু ধনু মোল্লার শারীরিক অক্ষমতা তাকে মুক্তি দিয়েছে। পরীর কর্মতৎপরতা ও সাংসারিক মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে এই গল্পে।

> সারাদিন মোল্লাবাড়ির হাঁড়ি ঠেলবার পর একথালা ভাত নিয়ে গিয়েও রেহাই পায়নি। পেটভরে খেয়ে উঠেও লোকটা গায়ে হাত তুলল। তাও যে সে মার নয়। কিল চাপড় দেখা যায় না, কিন্তু রোজ রোজ কাঁচা শরীরে কত সয়।[৪১]

নিজের প্রতি ধিক্কার দেয় পরী :

> নসিব! সব নসিব! না হলে এমন জামাইয়ের হাতে পড়বে কেন পরী। চোরের চেয়ে চাষা-ভুষা অনেক ভালো।[৪২]

---

৩৯ 'পাশবিক', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৪৬

৪০ শিল্পী খানম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৪১ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫১

৪২ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫১

'পরী' গল্পের পরী স্বামীর চৌর্যবৃত্তির পথে গেলেও তার মধ্যে শুদ্ধসত্তার জাগরণ উপলব্ধি করি আমরা। মাতবরের দেয়া অর্থ, অলংকার কিংবা বিয়ের প্রতিশ্রুতি কোনো প্রলোভনের কাছেই নতি স্বীকার করে না বিবাহিতা তরুণী। অথচ তার বিবাহিত জীবনও সুখের নয়। মাতবরের গৃহে চুরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীর মন সায় দেয় না, ফলে স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হতে হয় তাকে। সততা-শুদ্ধ বিবেকবর্জিত একটি মনই তাকে দাম্পত্য জীবন-লগ্ন রাখে। স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হওয়ার রাতে সে নিজ গৃহ ত্যাগ করে মাতবরের রান্নাঘরে আশ্রয় নিলে ধনু মোল্লা সেই সুযোগটি গ্রহণ করলে সে প্রকৃতই বিপদের সম্মুখীন হয়। বৃদ্ধ মোল্লার শারীরিক ব্যর্থতা তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে। বৃদ্ধের দেয়া উপহারসহ বর্বর স্বামীর কাছেই অতঃপর প্রত্যাবর্তন করে সে। স্বামীর চৌর্যবৃত্তি, তার ওপর স্বামীর বর্বরতা, আরেকটি সুযোগ পেলেই বিয়ে করার জন্য স্বামীর লোভী মনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিষ্প্রেম দাম্পত্য জীবন বিষয়ে সচেতনতা প্রভৃতি সত্ত্বেও পরীর এই গৃহ প্রত্যাবর্তন, স্বামীকে খুশি করার জন্য উপহৃত বস্তুসামগ্রী নিয়ে মিথ্যাচার প্রভৃতি পরীর এক জটিল মনোবিশ্বকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে। সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির বাস্তব জীবন এখানে ফুটে উঠেছে।

মাতবরের সম্পদের প্রতি নির্মোহ ভাব এবং স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা পরীর সততার দৃষ্টান্তরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরী ও রহিমের সংসারে ধনু মোল্লার আবির্ভাব এবং তার সঙ্গে যৌনচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী রহিমকে মারার সংবাদে সে খুশি হতে পারেনি।

> পরীর বুকের ভেতরটা লোমে ঢাকা মুর্গির সিনার মতো দুরুদুরু করে কাঁপছিল। বলছে কি লোকটা? মাথা খারাপ হয়ে গেল। ওর মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না। এতবড় তাগড়া জোয়ান লোকটাকে বুড়ো শেষ করে দিতে চেয়েছে?[৪৩]

মোল্লার যৌবনহীন যৌনাবেগের পরিণাম দেখিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। তিনি লিখেছেন মোল্লার জবানিতে :

> দ্রুত ধুকধুক করতে করতে ধনু মোল্লার হৃৎপিণ্ডটা বিকল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ঘনঘন হাঁপাচ্ছে, মুখের দুই কষে ফেনা দেখা দিয়েছে। পরী উঠে পড়তে চাইলে ওকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়ে বললো, আরেকটু থাক্ পরী, আরেকটু! কিন্তু সব বৃথা। দুই হাতে মুখ ঢেকে মাটি লেপটে বসে পড়ে ধনু মোল্লা। বিফল সব উদ্যম, সব আয়োজন বিফল।[৪৪]

এরপর পরীর দিকে তাকিয়ে কাতর কণ্ঠে ধনু মোল্লার আহ্বান :

---

৪৩ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫৫

৪৪ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫৫

তুই যাইসনা পরী। আরেকবার দ্যাখ আমি পারুম।[৪৫]

কিন্তু পরী বিরক্তির সুরে বলল–'বুইড়া'! তার পর পরী চলে গেলে ধনু মোল্লা রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বসে রইল :

অন্ধকারে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে ধনু মোল্লা। পথের ধারে ধূলিবালির মধ্যে বসে থাকা ভিখিরির চেয়েও দীন-হীন রিক্ত নিঃস্ব যেন।[৪৬]

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'পরী' গল্পে মানুষের অনিবার্য পরিণতি-বিধানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মানব জীবনে যৌনতা প্রধান চাহিদা হলেও একটা বয়সের পরে মানুষকে থামতে হয় বার্ধক্যের কাছে। কিন্তু ধনু মোল্লার অনুভূতি এসবের বিপরীতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ধনু মোল্লাকে নিয়ে আজহার ইসলাম লিখেছেন :

বয়সের তেল ফুরিয়ে যাওয়া এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি যুবতী পরীর নিবিড় সংস্পর্শে অকস্মাৎ যৌনতার এক অস্বাভাবিক গন্ধে পাগল হয়ে যায়। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে হলেও সে তার হঠাৎ জেগে ওঠা রিরংসা-বৃত্তিকে চরিতার্থ করার সুযোগ গ্রহণ করে যখন পরীর নগ্ন সুধা পানের উদ্যোগ নেয়, তখন দেখা গেলো কালের অমোঘ বিধানে তার দেহযন্ত্রটি পীড়াদায়কভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।[৪৭]

শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ ধনু মোল্লা নামাজ পড়ে ওজিফা করে হজ্বে যাবার বাসনা পেশ করে বলে :

তরা হগলতেই হুন, আমি এবার হজ্বে যাইয়াম্। গতরাত্রে তরার মা'রে দেখলাম, হেই পরীর বেশে আইয়া আমারে তাই করতে কইছে।[৪৮]

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'পরী' গল্প দীর্ঘ-আকৃতির গল্প। গল্পের পরিণামে লিবিডোচেতনায় সমর্পিত হয়েছে কাহিনি। আজাদের 'পরী' গল্প প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

ধনু মোল্লা নামক এক বৃদ্ধের বিকৃত যৌন লালসার শিকার এক দরিদ্র গৃহবধূ। দরিদ্রক্লিষ্ট চোর রমুর স্ত্রীর পরী, জীবিকার প্রয়োজনে ধনু মোল্লার বাড়িতে ঝি-এর কাজ নেয়। বৃদ্ধ বয়সে ধনু মোল্লার বিকৃত লালসা পরীর কাছে এসে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। হতাশায় ক্ষোভে সকালে বাড়ির সকলকে জানিয়ে প্রথম স্ত্রীর স্বপ্নাদেশ হজ্ব পালন করার বিষয়টি জানিয়ে ক্ষান্ত হন।[৪৯]

যদিও কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি স্বপ্নাদেশের কথা তবুও গল্পকার এর মধ্যে দিয়ে যৌনতার বিপ্রতীপে সুখী দাম্পত্যের অনুশাসনের প্রতি উৎসাহ দিতে সচেষ্ট থেকেছেন।

---

৪৫ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫৫

৪৬ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫৫

৪৭ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃ. ২১৩

৪৮ *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫৭

৪৯ শিল্পী খানম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮)

'অন্ধকার সিঁড়ি' আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রতীকী গল্প। এ গল্পে আছে মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা ও লীনা নামের এক তরুণীর মনোবিকলনের চিত্র। চাকরি না পাওয়া বেকার যুবক দুলাল তার বোনকে ব্যবহার করে চাকরি পেতে সচেষ্ট হয়েছে। বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে হলেও যেন তার চাকরি হয়, এই-ই তার মনোবাসনা। জনপ্রতিনিধি সবুর সাহেবের আস্তানায় বোন লীনাকে নিয়ে যায় দুলাল। সেখানে সে পুরুষের দেহলোলুপতার শিকার হয়। যৌনসঙ্গমের পরে লীনার বক্তব্য :

> আমাকে বাসায় নিয়ে চল জলদি, ওর মনে হচ্ছিল বমির সঙ্গে ভিতরের নাড়িভুঁড়ি উগরে আসবে বুঝি! কিন্তু কিছু অজীর্ণ তরকারির টুকরো ও তরল পদার্থ ছাড়া বিশেষ কিছু বেরুল না।[৫০]

অন্যদিকে লীনা ডাক্তার করিমের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। পরে প্রেম থেকে নিজের অজান্তে কামে জড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে লীনা গর্ভবতী হয়ে যায়। পরে ডা. করিমকে জানালে করিম এটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলে এবং বাচ্চাকে নষ্ট করে দিতে চায়। কিন্তু লীনা করিমের ঔরসজাত বাচ্চাকে নষ্ট হতে দেবে না। লীনার প্রতিবাদী সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ অংশে। লীনা ডাক্তার করিমকে প্রশ্ন করে :

> এতো বড়ো পৃথিবীটাও একটা ছোট্ট তুলতুলে শিশু আর তার মাকে জায়গা করে দিতে একেবারেই অক্ষম?[৫১]

এ গল্পে দেহলোলুপ রাজনীতিবিদ এবং ডাক্তারের প্রতারণাকে সামনে এনেছেন গল্পকার। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে পরিণামহীন পথে হেঁটে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় মানুষ। মানুষের জীবনের নানামুখী বাস্তবতায় সেসব প্রমাণিত ধ্রুব সত্যতার সঙ্গে। আলোচ্য গল্পে লীনা শেষ পর্যন্ত সমাজের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান পায়নি। নারীকে ভোগের সামগ্রী বানিয়ে ফায়দা নিচ্ছে কতিপয় সুবিধাবাদী। গল্পকার এ গল্পে গর্ভের সন্তান, সে নিষ্পাপ, তার অনাগত দিন তথা পৃথিবীতে আগমন সুখের হোক সে বিষয়ে ইঙ্গিত যেমন করেছেন, তেমনি করিম ও লীনার দেহজ কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের প্রগাঢ় লিবিডোতাড়নার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

---

[৫০] *শ্রেষ্ঠগল্প*, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.), লি., ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৩

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

যখন সৈকত (সেপ্টেম্বর ১৯৬৩)

এই গল্পে কলিম ও মর্জিনার প্রেম প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পটিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ এবং সেই সন্দেহের সূত্র ধরে প্রতিহিংসার পথে হেঁটে শেষ অবধি প্রেমে জাগরিত হয়ে জীবনের অমিয় সুধা তারা খুঁজে পায়।

কৈশোর থেকে গড়ে উঠেছে কলিম ও মর্জিনার প্রেম। বড় ভাইয়ের অমতে তারা দুজন বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হঠাৎ কলিম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়লে মর্জিনা তাকে সুস্থ করে তোলে। কলিম ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ফলে মর্জিনা উপার্জনের জন্য যেখানেই যায়, সেখানেই কেবল নারী-শরীরলোভী মানুষ নামের পশুদের দেখতে পায়। কোনোরকম টিউশনি করে চালিয়ে নিচ্ছে সংসার। হাওয়া বদলের জন্য কলিমকে নিয়ে মর্জিনা সমুদ্র সৈকতে যায়। আর্থিক অনটনের কারণে সেখানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু তালিবের বাড়িতে মেহমান হিসেবে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও চারপাশে কেবল দেহলোলুপদের দেখেছে মর্জিনা। এরই প্রেক্ষিতে কলিম তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। গল্পকারের বর্ণনায় উপস্থাপিত চিত্র :

> শৈশব যৌবন কর্মপ্রয়াস, সর্বত্র মর্জিনা। মিলনে মর্জিনা, বিরহে মর্জিনা, আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো মর্জিনার অস্তিত্ব। অথচ আগামী সকাল থেকে মর্জিনা অদৃশ্য হবে; রক্ত-মাংসের মূর্তি হিসেবে চিরতরে হয়তো শুধু মর্জিনা নামে একটি কল্পনা; একটি ভাবনা, কিংবা দূরবর্তী কোনো স্বপ্নের রেশ।[৫২]

তবে মর্জিনাকে আত্মসমর্থনের সুযোগ দিতে চায় কলিম। তালিবের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জন্য কলিম প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> তালিবের সাথে মর্জিনার তেমন কিছু হয়নি। হয়েছে অন্যত্র। মর্জিনা সেসব স্বীকার করতে চায়। সমাজের চোখে সে ভ্রষ্টা হলেও ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনা হবার কারণগুলো জানাতে চায়। কারণগুলো জানার পর মর্জিনার যদি অপরাধ হয় তাতে মৃত্যুকে মেনে নিতে রাজি আছে সে। কারণ মর্জিনা নিজের সুবিধার জন্য বা কাম-উন্মাদনার মোহে পড়ে অন্যের হাতে বিলিয়ে দেয়নি নিজের শরীর। অনন্যোপায় হয়ে বাধ্য হয়েছে এ কাজে।[৫৩]

মর্জিনা আরও বলে–"আমি যা করেছি সব তোমার জন্য।"[৫৪] এসব শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় কলিম। ক্যান্সারে আক্রান্ত কলিমকে বাঁচানোর প্রয়োজনে অনেক কিছু সহ্য করেছে মর্জিনা। মর্জিনার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ছিল অগাধ। স্বামীকে বাঁচানোর জন্য তার জীবনের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। পতিব্রতা মর্জিনা বলেছে :

---

[৫২] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২০৫

[৫৩] ড. ইবাইস আমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প : বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পরূপ*, পৃ. ১১১

[৫৪] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২০৭

বেহুলা যদি যমের হাত থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে আনতে পারে, এ যুগের আমি নারী কি একটু ওষুধও তোমার মুখে তুলে দিতে পারবো না?[৫৫]

মর্জিনা এরপর চাকরি নিতে গেলে সেখানেও দেহলোলুপতার শিকার হয়েছে। মর্জিনার উক্তি :

যে বাড়িতেই যাই আমার দেহপানে তাকিয়ে থাকে পুরুষ মানুষেরা। এক মাসে চার বাড়ি বদলালাম–দুই বাড়ির কর্তা, আর দুই বাড়ির ছেলে-ছোকরাদের জ্বালায়। সক্কলেই প্রেমের বিদ্যাসাগর। কত আর সইতে পারি। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং শেষ পর্যন্ত একজনের কাছে ধরা দিতে হল।[৫৬]

মর্জিনার জীবনের করুণ কাহিনি শুনে কলিম পুনরায় মর্জিনার প্রতি তীব্র অনুরাগ অনুভব করে এবং মর্জিনাকে কাছে টেনে নেয়,

না, মর্জিনা। তোমাকে ছাড়বো না। বুকের কাছে সজোরে আঁকড়ে ধরে কলিম সৈকতের দিকে আসতে আসতে বলল, সমুদ্রে ডুব দিয়েছি, এবার আমরা নতুন করে বাঁচবো মর্জি, নতুন করে বাঁচবো।[৫৭]

সমাজের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে সতীত্ব বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে হারমানা মর্জিনা স্বামীর খুনের অভিপ্রায় শুনেও ভালোবাসায় পিছপা হয়নি। যৌনতার সঙ্গে প্রেমের উত্তরণ ঘটেছে মর্জিনা-কলিমের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

জীবন জমিন (১৯৮২)

'জীবন জমিন' গল্পে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে *হরিণমুখী* নদীর ভাঙনের সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে আছে হানিফ শেখ। বাবার বন্ধুর মেয়ে আমিনাকে বিয়ে করেন হানিফ। প্রথম সন্তানের জন্মের সময় মারা যায় আমিনা। পুত্র রুস্তমের মানুষ করার প্রয়োজনে শরবতীকে বিয়ে করে আনে। সেও একদিন চলে যায়। হানিফ এখন নিঃস্ব। তবে প্রেমের পূর্বস্মৃতি সহসা উসকে দিয়েছে তার মনকে :

যখন আদর করছিলো, আমিনা তখন বলেছিলো, অহনতো ইমুন কর, আমি মরলে তিনদিনও যাইবো না, আর একটা শাদি করবা। ইমুন কথা কইও না, খুদার কসম। তখন হানিফের চোখজোড়া ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছিলো, বলেছিলো, তোমারে ছাড়া আমি বাঁচুম না।[৫৮]

---

[৫৫] *শ্রেষ্ঠগল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লি., ঢাকা ২০০১, পৃ. ২০৭

[৫৬] *শ্রেষ্ঠগল্প*, আলাউদ্দিন আল আজাদ, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লি., ঢাকা ২০০১, পৃ. ২১০

[৫৭] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২১১

[৫৮] *শ্রেষ্ঠগল্প*, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লি., ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩০৯

হানিফের মনস্তত্ত্ব, পুত্র বিয়োগের পূর্বাপর পরিস্থিতি তাকে মানসিকতার তীব্র দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে। যৌনবিকারগ্রস্ত হানিফের সঙ্গে নিঃসঙ্গ স্বামী বিয়োগে বৈধব্য বরণকারী হানিফের পুত্রবধূ রাতের অন্ধকারে জয়নাবের ছদ্মবেশে যৌনসঙ্গমে আবদ্ধ হয়। হানিফের ভাষ্যে :

> আমি তরে চাই, নাইলে বাঁচুম না। তুই ক্যাডা? মুখটা দেহি? দেইখ্যেন না, তাইলে আমারে পাইবেন না। তার গতরে হাতের পাতায় আদর করতে করতে বললো আমি মইরা যামু গা।[৫৯]

হানিফ জব্বারের বউ জয়নাব ভেবে যার সঙ্গে সঙ্গম করেছে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার মুহূর্তে আবিষ্কার করে সে তারই পুত্রবধূ তুফানি। ক্ষোভে ফেটে পড়ে হানিফ।

> হারামজাদী মাগী আমার লগে বেইমানী করছস, আমি তরে মাইরা ফালামু।[৬০]

তুফানিকে মারতে উদ্যত হলে তুফানি উচ্চারণ করে সমাজ-বিরুদ্ধ শ্বশুরের কার্যকলাপ :

> আমারে মারেন আপনে, তাড়াতাড়ি মারেন, মাইরা ফালাইয়া দ্যান। কিন্তুক; কিন্তুক আমার প্যাডে আপনের–আপনের পোলা আছে। আপনের পোলা ফিইরা আইতাছে।[৬১]

আদিম নিষিদ্ধ যৌনাচারের প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে। শ্বশুরের সঙ্গে পুত্রবধূর যৌনতার সর্বগ্রাহী যে রূপ চিহ্নিত করেছেন আজাদ তা তার সাহসিকতার পরিচায়ক। 'জীবন জমিন' গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে। সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকের মতোই গর্ভবতী হওয়ার বিষয় এ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। যৌনতার সর্বগ্রাহী রূপের চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

চুরি (১৯৫৯)

'চুরি' গল্পে মাহতাব চরিত্রের নানামাত্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে পাঠক-হৃদয়ে নতুন ভাবের সৃষ্টি করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। 'চুরি' গল্পের মাহতাবের প্রথম জীবনের সঙ্গী কাজের ঝি'র কন্যা সাজু। সাজুর অভাবগ্রস্ততাকে পুঁজি করে মাহতাব তার প্রতি যৌনাকর্ষণ অনুভব করে কিন্তু আজ মাহতাব আইনজীবী আর সাজু বিধবা হয়ে জীবন যাপন করছে। দীর্ঘদিন পর গ্রামে এসে সাজুকে দেখে মাহতাবের পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়, সাজুর বিয়ের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বর্তমানে সে কিছু করতে চায় সাজুর জন্য। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

---

[৫৯] *শ্রেষ্ঠগল্প*, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লি., ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩১৪

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

> কিন্তু সাজুর কঙ্কালসার শুকনো চেহারাটা সত্যিই মর্মান্তিক। ওর ভাগ্যের চাকাকে ঘুরিয়ে দেয়া যাবে না, কিন্তু খানিকটা দুঃখ মোচন তো সম্ভব। ওকে সাহায্য করা উচিত।[৬২]

কিন্তু সাজুকে সাহায্য করতে গেলেও সে সাহায্য নেয়নি। মানব মনস্তত্ত্বের নানা প্রান্তের বিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে এ গল্পে। গ্রামে আত্মীয়-পরিজনকে দেখতে গমন করে মাহতাব, কিন্তু নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কেউ কাছে আসে না। মাহতাবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে উঠে এসেছে :

> নিজের ব্যবহারে রূপান্তরের ছায়া দেখে, বিদেশী কায়দায় ধোপদুরস্ত, খাওয়া দাওয়া, খুঁৎখুতে মাহতাবও একটু বিস্মিত হয় বৈকি?[৬৩]

মাহতাব ভাবে মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে :

> তাহলে কি অস্তিত্বের দুটো স্তর? একটাকে সে জানে এবং অন্যটাকে জানে না? বাইরের আবরণে সে বিলেত ফেরৎ তরুণ আইনজীবী সেখানে তো মাটির গন্ধও নেই, কিন্তু যেখানে কিশোরী সাজু জিভ বার করে মুখ ভ্যাংচায় সেখানে তার পরিচয়? এই বুঝি সকলেরই অবস্থা। আসলে সব মানুষই নানা মানুষ।[৬৪]

'চুরি' গল্পে মানুষের মনোবিকলনের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন গল্পকার।

ধোঁয়া (ডিসেম্বর ১৯৬২)

'ধোঁয়া' গল্পটি ত্রিভুজ আকর্ষণের বহুকৌণিক প্রেক্ষণবিন্দুতে রচিত যৌনাকর্ষণের গল্প। চা বাগানে কর্মরত আবিদের সংসার গড়ে উঠেছে পাহাড়ি টিলায় স্ত্রী রাহেলা ও কয়েকজন চাকর-বাকর নিয়ে। এই গল্পে স্ত্রী রাহেলার বিপরীতে কাজের মেয়ে কালীর প্রতি যৌনাকর্ষণের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পকার এই গল্পের মধ্য দিয়ে আবিদ নামক চা বাগানের কর্মকর্তার জীবনের নানামাত্রিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। একদা রাহেলাকে প্রেমে রাজি করাতে ছিল বদ্ধপরিকর। সেই আবিদই আবার স্ত্রীর প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কাজের মেয়ে কালীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে সংসার পরিত্যাগ করে। কালীর প্রতি কামজ প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে সংসার ত্যাগকারী আবিদ যেন নতুন কালের প্রতিভূ। আবিদ যে কালীর প্রতি আকৃষ্ট রাহেলা তা বুঝে ফেলে। কিন্তু রাহেলা কখনোই আবিদকে আর কারোর সঙ্গে ভাগ করতে পারবে না। অন্যদিকে কালী প্রাণ-মন সঁপে দিয়েছে আবিদকে। ঘর বাঁধার আশ্বাসে, শেষ পর্যন্ত ঘর বাঁধার প্রশ্ন অমীমাংসিত তো

---

৬২ শিল্পী খানম, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে জীবনবোধের রূপ-রূপান্তর*, পৃ. ৫৮

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

থাকলই; উপরন্তু আবিদ রাহেলার জীবন ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রেম ও যৌনতার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের নেশা মানুষের স্বভাবজাত। যার ফলে মানুষ এক নারী-পুরুষে দীর্ঘদিন আকৃষ্ট থাকে না।

'ধোঁয়া' গল্প প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> আলাউদ্দিন আল আজাদ যৌনতার সর্বগ্রাসী প্রবণতা বেশ কিছু ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু করেছেন। যুগের পরিবর্তনে মানুষের প্রেম ও যৌনতায় পরিবর্তন লক্ষণীয়। পশ্চিমা শিল্প-সাহিত্যের অবাধ যৌনতা বাংলা সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। সূচনা পর্বের বাংলা ছোটোগল্পের মতো রাখঢাক করে প্রেম ও যৌনতাকে আড়ালে-আবডালে রাখার শিল্প-কৌশল আর টিকছে না। আধুনিক মানুষের মননে, চিন্তায় অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত। জীবনের কাছে অনেক দাবি তার। জীবনকে ষোলকলায় পূর্ণ করতে যা করার তাই করতে মানুষ চেষ্টা করছে।[৬৫]

শেষ পর্যন্ত আবিদের কাছে যৌনকামনাই বড় হলো এবং সে অতৃপ্ত যৌনকামনার পরিতৃপ্তি ঘটাল। স্ত্রী-পরিবার সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে গেল আর যৌনতাই জয়ী হলো। এটা ছোটগল্পের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা যায়।

রত্না আমি ও একটি কুকুর (১৯৮১)

'রত্না আমি ও একটি কুকুর' গল্পে প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে যৌনচেতনার সম্পর্কটি স্পষ্টাকারে তুলে ধরেছেন গল্পকার। এই গল্পটিতে গৃহশিক্ষক আনিস ধনী মফিজুর রহমান ও হামিদা বেগমের দুই মেয়েকে পড়াতে গিয়ে বড় মেয়ে আঞ্জুমান আরা রত্নার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। আনিস নিজের মনের অজান্তে ধনীর দুলালী রত্নাকে ভালোবেসে ফেলে। রত্নার সম্পর্কে আনিসের বক্তব্য :

> হঠাৎ করে রত্নাকে আমি এমন ভালোবেসে ফেলবো তা আমার ধারণার মধ্যেও ছিল না। অথচ তা ঘটে গেছে। এখন আমি রত্না ছাড়া কিছু বুঝি না। রত্না আমার সারা অস্তিত্বজুড়ে, হাঁটছে, ভাসছে। আমার প্রাণে রত্না, আমার ধ্যানে রত্না, রত্না আমার শয়নে, স্বপ্নে রত্না আমার।[৬৬]

অপরদিকে রত্নার প্রেমিক রানা আছে, সেসব জেনে আনিস মন খারাপ করলে রত্না বিষয়টিকে সামলে নেয়। সত্যিকার ভালোবাসা আনিসের প্রতি রত্নার না থাকলেও প্রবল যৌনাকর্ষণের কারণে আকর্ষণ করে আনিসকে। লিবিডো বা যৌন-আসক্তি পেয়ে বসে রত্নাকে। রত্নার সঙ্গে আনিসের প্রথম কামজ প্রেম উন্মোচিত হয়।

---

[৬৫] ড. ইবাইস আমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প : বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পরূপ*, পৃ. ১০৮

[৬৬] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২৯১

তেমন কিছুই ছিলো না অথচ ওর মুখমণ্ডল নিমিষে রক্তিমাভ হয়ে গেল এবং একটা চাপা আবেগে যেন কাঁপছে। আমিও শিহরিত এমন কোমল মসৃণ হাত। সারা অস্তিত্বে প্রথম স্পর্শের এক অনির্বচনীয় স্বাদ অনুভব করে বিহ্বল হয়ে গেলাম।[৬৭]

এভাবেই রত্নার মনের গহিনে লুকিয়ে থাকা কামতৃষ্ণার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রানার সঙ্গে রত্নার সম্পর্ক থাকার পরও গৃহশিক্ষক আনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে রত্না। বলতে গেলে আনিসের প্রতি ছিল রত্নার দেহজ কামনা বাসনা। আনিসের সঙ্গে রত্নার সম্পর্ক নিয়ে যখন রানা প্রশ্ন তুলেছে তখন রত্না অস্বীকার করে বলেছে যে, আনিস ছেলেটা শুধু গৃহশিক্ষক। বাড়িতে আসে এজন্য তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। এ পর্যায়ে রত্না আনিস প্রসঙ্গে তাচ্ছিল্য করে বলেছে, 'আমরা কুকুরের দিকেও তো হাড্ডি ছুড়ে দিই।"[৬৮] এখানে রত্নার বহুরূপী চরিত্র ফুটে উঠেছে। সে পোষা কুকুরের সাথে আনিসের তুলনা করতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করেনি। গল্পকার এ গল্পে প্রেমজ ও কামজ প্রভাবে প্রভাবিত মানুষের মনস্তত্ত্ব ও আচরণ বিশ্লেষণে সচেষ্ট ছিলেন। ধনীর দুলালি রত্নার প্রচণ্ড যৌনাবেগ ও উদ্দাম যৌনজীবনের বিপরীতে মধ্যবিত্তের প্রতীক আনিসের জীবন ও তার পবিত্র প্রেমের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে সামাজিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন গল্পকার।

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে নর-নারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। নর-নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও যৌনতা যে আদিম সত্য তারই বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য গল্পগুলোতে। নর-নারীর বিচিত্র প্রেমের অনুভূতির স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রকাশ এবং ধর্মীয় আবরণের বাইরে এসে মুক্ত স্বাধীন জীবনাচরণের যে ইচ্ছাশক্তি তারই প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে উল্লেখিত গল্পগুলোতে। যেহেতু আলাউদ্দিন আল আজাদ সমাজমনস্ক শিল্পী, সেজন্যই তিনি সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে ফ্রয়েডীয় চেতনার আলোকে চরিত্র সৃজন করে ছোটগল্পকে কালোত্তীর্ণ করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

---

[৬৭] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৩০১

[৬৮] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৩০৫

চতুর্থ অধ্যায়

আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ

আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ

বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্প-সাহিত্য যে কয়েকটি চিন্তনপ্রক্রিয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল তার একটি হলো মনোবিশ্লেষণের কৌশল প্রয়োগ করে মানুষের অন্তর্জগৎ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এই মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি ছাড়াও অন্য চিন্তাকাঠামো হলো কার্ল মার্কসের দর্শন, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের কল্যাণে বিশ্ববীক্ষা এবং নৃবিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে নবতর জ্ঞান অর্জন। ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকে কার্টেজীয় (cartesiary) দর্শনের পরবর্তীকালে রোমান্টিক কবিরা ভলতেয়ার, রুশোর তত্ত্ব এবং হেগেলের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হন। যদিও ভিক্টোরীয় যুগের প্রথম দিকের সাহিত্যিকরা উপযোগবাদ (utilitarianism) যা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন কিন্তু পরবর্তী সময়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও তার পরে ফ্রয়েডের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বের কয়েকটি সিদ্ধান্ত :

ক. মানুষের বিকাশ সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝার উপায় হলো তার যৌন-ইচ্ছা।

খ. আমাদের মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রটি অভ্যাসবশত যৌন এবং আক্রমণাত্মক ইচ্ছাগুলোকে দমন করে থাকে এবং তার ফলে সেই ইচ্ছাগুলো ধ্যান-ধারণার অবচেতন অবস্থার মধ্যে সংরক্ষিত হয়।

গ. অবদমিত ইচ্ছাগুলোর সঙ্গে অবচেতনে যে সংঘাত চলে তা অনেক সময় স্বপ্ন বা অন্য ধরনের পলায়নী পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজে নেয়।

বিশ শতকের প্রথম দিককার আত্ম-অনুসন্ধানী উপন্যাস (introspective novel) ফ্রয়েডের প্রভাবে রচিত। এছাড়া Internal Monologue (অন্তর্গত কথোপকথন)-এর উপন্যাস এবং T. S. Elliot-এর কবিতায় Imperionism দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগ-পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ষাটের দশকে পাকিস্তানি আমলে আইয়ুব খানের শাসনামলে সামরিক শাসন-শোষণ নির্যাতন রাষ্ট্রকাঠামোর আওতায় থাকা জনগোষ্ঠীর মনোজাগতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মনোজগতে সৃষ্টি করেছে আত্মমগ্নতা, পলায়নপর মানসিকতা এবং জটিল মনোবিকার। তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়ন, সমাজের ক্ষত-বিক্ষত চেহারা এসব ঘটনাংশ

শিল্পীদের বাইরের ঘটনায় জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে অন্তর্গত নিঃসঙ্গতাকে সাহিত্যে রূপায়ণ করেছেন। ষাটের দশকের কথাসাহিত্যে ব্যক্তিক মনোজাগতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শিল্পরূপ লক্ষণীয়।

> ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যক্তিবাদের মূল রেনেসাঁসের মানববাদী প্রবর্তনা। মানবতাবাদ থেকেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম; ঐতিহাসিক কারণে মানুষের ব্যক্তিসত্তা যতোই সমাজাতিরিক্ত বা সমাজ বিরোধী হয়ে উঠেছে ততোই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মসচেতনতার প্রগতি। সমাজ জীবনের দ্বন্দ্বময় ও জটিলরূপ বাংলাদেশের উপন্যাসিকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনাকেও নতুন নতুন ধারায় প্রবাহিত করেছে।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পাকিস্তান কালপর্বে বাংলাদেশের উপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখকেরা ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের শিল্পরীতিকে অনুসরণ করতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থসামাজিক জীবনের বিচিত্র মাত্রিক জটিলতায় মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের সঙ্গে অন্তর্গত যন্ত্রণা প্রযুক্ত হয়ে শিল্প-সাহিত্যে রূপায়ণ ঘটে নতুন ধারার মনস্তত্ত্বপ্রধান সাহিত্যকর্ম।

> ১. বিরুদ্ধ সময় ও সমাজ অন্তরালবর্তী ব্যক্তি মানুষের উদ্বেগ, যন্ত্রণা ও ক্রন্দন আবিষ্কারের ঐকান্তিকতায় এই নব আঙ্গিক বাংলাদেশের উপন্যাস প্রবাহে এক নতুন মাত্রা সংযোজনে সমর্থ হয়।[২]
>
> ২. ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ কালপর্বে বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিকগণ বিষয় বৈচিত্র্যে বাচনভঙ্গির ভিন্নতায় এবং চরিত্র চিত্রায়ণের নানাবিধ গতিবিধি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।[৩]

আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* ও *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসের ব্যক্তিক সংকট, মনোজাগতিক জটিলতার প্রকাশ লক্ষণীয়। সমালোচক লিখেছেন :

> আলাউদ্দিন আল আজাদের তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষের সংকট, মনোবিকলন, অন্তর্যন্ত্রণা ও যৌনবিকৃতির বিন্যাস ঘটেছে। এ দুটি উপন্যাস ফ্রয়েডীয় তত্ত্বচিন্তাকে শৈল্পিক অনুশীলনের সদর্থকতায় উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। জীবনকে বহু কৌণিক অবয়বে প্রত্যক্ষ করার অভিপ্রায় মানুষের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই নিরাসক্তভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তিনি।[৪]

সিগমুন্ড ফ্রয়েড কিংবা হ্যামলক এলিসের কাছ থেকে বিশ্বের পাঠকেরা বুঝেছেন মানুষ যখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালোবাসা বা প্রেম অনুভব করেন তখন তার অবচেতন সত্তায় জন্ম নেয় কামবাসনা বা যৌনাবেগ। নারী-পুরুষের মনের একান্ত গোপন চেতনাকে প্রকাশ করেছে আলাউদ্দিন আল আজাদ।

---

১ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৫-১৪৬

২ রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-০৯

৩ হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, পৃ. ২০৮

৪ তপন জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও ইংরেজি সাহিত্য*, কলকাতা, ২০২০/ই জার্নাল/www.jaladarchi.com/2020/09/sigmund.freud-and englsih literature, p. 3

নরনারীর ব্যক্তিক সুখ-দুঃখ গাথা এড়িয়ে হৃদয়পটে মাঝে মাঝে উঁকি দেওয়া প্রবল চেতনার বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে আজাদের কথাসাহিত্যে। আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *অনূদিত অন্ধকার* এবং *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* এই পাঁচটি উপন্যাসে।

ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব প্রযুক্ত করে আলাউদ্দিন আল আজাদ শিল্প সফলতা দেখিয়েছেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে মনোসমীক্ষণ (Psychoanalytic) সাহিত্যে ব্যবহার শুরু হয়। Monte লিখেছেন–

> Psychoanalytic theories assume the existence of unconscious internal states that motivate and individuals overt actions.[5]

আধুনিকমনস্ক শিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ আধুনিক উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি তার উপন্যাসে নানামাত্রিক শিল্পপ্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আধুনিক উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণ প্রসঙ্গে সমালোচকদের মন্তব্য স্মর্তব্য :

> মহৎ ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় প্রেরণা হিসেবে তাঁর সময়, সমাজ ও আর্থ-উৎপাদন কাঠামোলালিত জীবন-উৎসের ভূমিকাই মুখ্য। কেননা যে-মানব অস্তিত্বের বহুস্তরীভূত রূপ ও স্বরূপ উপন্যাসশিল্পের আবহমান উপজীব্য, নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই তা বহমান কিন্তু প্রকরণ-নির্মিতির প্রশ্নে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, জীবন-অনুধ্যান ও অনুশীলনের স্বতন্ত্র চারিত্ররূপের সন্ধান অপরিহার্য। কারণ, সমাজ-শর্তলগ্ন হয়েও একজন শিল্পী আন্তরজাগতিক অভিপ্রায় ও অভিজ্ঞানে, বোধ ও সংবেদনায়, আকাঙ্ক্ষা ও মনস্তত্ত্বে, অস্তিত্বচেতনা ও জীবন দর্শনে অর্থাৎ নান্দনিক অনুভবে পৃথক।[৬]

শিল্পরীতির কাঠামো সূত্রে উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণের দিকে তাকালে দেখা যায় উপন্যাসের শিল্পীরীতির কাঠামো গড়ে উঠেছে নিম্নোক্ত উপায়ে :

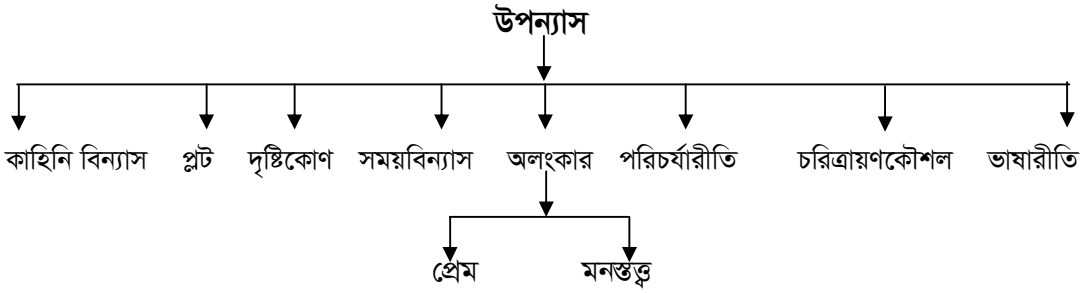

[৫] Md. Mahroof Hossain, "Psychoanalytic theory used in English literature: A Descriptive study," global Journal Inc, USA, পৃ. ২

[৬] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

আলাউদ্দিন আল আজাদের সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা ইউরোপীয় উপন্যাসের শিল্পরীতিকে অনুসরণ করে সমাজপ্রেক্ষাপটে ব্যক্তিক মানসের স্বপ্নভঙ্গ ও জীবনপ্রবাহের নানা দ্বন্দ্বময় কাহিনি উপস্থাপনে উপন্যাসের শিল্পকাঠামোয় রূপান্তর ঘটেছে। সমালোচক লিখেছেন :

> বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক জীবনের বিচিত্রমাত্রিক জটিলতায় মানুষের সামূহিক অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন। ফলে মানবিক উৎকণ্ঠা উদ্বেগ হয়ে ওঠে ব্যক্তি-আশ্রয়ী; বিপন্ন বিধ্বস্ত বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ চৈতন্যের তমসাচ্ছন্ন অন্ধ গুহায় আত্মপলায়নকেই মনে করে জীবন। প্রচলিত ঔপন্যাসিক ফর্ম এই মানবিক সংকটের ফলে রূপান্তর লাভ করে। জন্ম নেয় Anti plot, Anti-hero, Anti-time উপন্যাস।[৭]

এ পর্যায়ে উপন্যাসের কাঠামোতে মানুষের নিজস্ব বাস্তবতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রফিকউল্লাহ খান লিখেছেন :

> বহির্বাস্তবতার পরিবর্তে অন্তর্বাস্তবতাই হলো আমাদের ঔপন্যাসিকদের আরাধ্য।[৮]

আধুনিক কথাশিল্পী হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *অনূদিত অন্ধকার*, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* উপন্যাসগুলো প্রকরণ-শৈলীর অন্যতম বিষয় হিসেবে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের সূত্র ধরে মানব মনস্তত্ত্ব ও প্রেম প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র দেশভাগ-পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের পাঠকপ্রিয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে একজন চিত্রশিল্পীর প্রেম, দাম্পত্য সংকট, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জীবনাকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। চিত্রশিল্পী জাহেদ ও স্ত্রী ছবির প্রেমকাহিনির সঙ্গে মনস্তত্ত্বের জটিলতা প্রযুক্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উপন্যাসটির কাহিনির শুরু করাচির পটভূমিকায়। করাচির শিল্প প্রদর্শনীতে চিত্রশিল্পী জাহেদের চিত্রকর্ম (অয়েল পোট্রেট নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি) নাম বসুন্ধরা-মাদার আর্থ পুরস্কৃত হয়। করাচিতে জাহেদের এই পুরস্কার বিজয়ের মুহূর্তে চিত্রকর্মের সৃষ্টি-উৎস সন্ধানকল্পে জাহেদের যে আত্মোপলব্ধি তারই সার্থক বিন্যাস এ উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খান লিখেছেন :

> একজন শিল্পীর জীবনানন্দ ও সৃজনানন্দের অন্তর্ময় বিন্যাসে ব্যক্তির মনো-জৈবিক পরিস্থিতির সমগ্র রূপ উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক।[৯]

---

[৭] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

[৮] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

চিত্রশিল্পী জাহেদের আত্মোপলব্ধিতে জীবন ও শিল্পের আন্তঃসম্পর্ক, প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়–

> বসুন্ধরা ছবিটি প্রথম প্রদর্শনেই সমালোচক ও সমঝদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এতে আমি সুখী। প্রতিষ্ঠা ও যশশিল্পী মাত্রেরই কাম্য এবং আমিও সেটা চাই। কিন্তু তবু বলতে পারি, ছবিটা হলঘরের এক কোণায় অনাদরে পড়ে থাকলেও খুব দুঃখিত হতাম না। কারণ আমার যা আসল পাওনা, তা পেয়ে গেছি অনেক আগেই। সে হল আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ। সে আনন্দ আনন্দের চেয়ে তীব্র, বেদনার চেয়ে গভীর, মৃত্যুর চেয়ে অনন্ত।[১০]

জাহেদের আত্মকথনের মাধ্যমে শিল্পীজীবনের যে প্রকাশ ঘটেছে তাতে বাংলাদেশের উপন্যাসের পটভূমি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। বস্তুত জাহেদের আত্মকথনে শিল্পীর মাঝে সৃষ্টির যে তাড়না, যে প্রচেষ্টা তা যেন স্রষ্টারই প্রতীক।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসে প্রেমকে ছাপিয়ে প্রেম ও প্রেম-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা ও তার পরিণতিই মূল উপজীব্য। জাহেদ ও ছবির মধ্যকার প্রেম-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক জটিল অন্তর্বাস্তবতায় পতিত করেছে। স্ত্রী ছবির শরীরে জাহেদ বিবাহ পূর্ব মাতৃচিহ্ন শনাক্ত করে। জাহেদের জিজ্ঞাসায় ছবি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করে তাঁর অবৈধ মাতৃত্বের ইতিবৃত্ত। জটিল অন্তর্জাগতিক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েও স্থির প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে শিল্পী জাহেদ। জাহেদের ভাষ্য :

> যদিও ভেতরে অনেক ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছে তবু অনেকক্ষণ একা একা বারান্দায় পায়চারী করতে করতে এটুকু বুঝলাম, ছবির ঘটনাকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার না করলে আমি ভুল করতে পারি। আর সে ভুলের ফল হবে মারাত্মক।[১১]

ছবির প্রতি জাহেদের সহানুভূতিপূর্ণ সমর্থন, নারীর প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া তাকে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধে জাগ্রত সমাজের প্রশংসা পেতে উৎসাহ দিয়েছে। ইউরোপীয় বোধে জাগ্রত ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে নারীর মূল্য প্রসঙ্গে প্রেমের মধ্য দিয়ে অর্জিত মাতৃত্বকে সত্য বলে জেনেছেন। এই উপন্যাসে জাহেদ-ছবি আখ্যানের সঙ্গে উপ-আখ্যান হিসেবে জামিল ও তাঁর স্ত্রী এবং মুজতবা ও মগকন্যা তিনার প্রেম ও পরিণামকে উপস্থাপন করেছেন। জামিল ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য-সংকট অতিক্রম করে সুন্দরতম পথে অগ্রসর হলেও মগকন্যা তিনা ও মুজতবার প্রেম অগ্রসর হয়েছে বন্ধুর পথে।

---

৯ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, পৃ. ১৫৫-৫৬

১০ *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৩৯০, পৃ. ১৬

১১ *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৬০, পৃ. ৯৭

তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে কাহিনির দীর্ঘায়িত ব্যাপ্তি, বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার এবং চরিত্র চিত্রণে লক্ষ করা যায় না বরং চরিত্রগুলো অন্তর্বাস্তবতায় নিমজ্জিত। করাচির প্রেক্ষাপটে কাহিনি শুরু হলেও ঢাকা শহরের চিত্রও আছে। এ উপন্যাসের কাহিনি প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য :

> তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে তিনটা স্তর আছে। প্রথম, একজন তরুণ শিল্পীর প্রেমে পড়ার গল্প। দ্বিতীয়, প্রেমই সতীত্ব, কোন নারী লম্পট পুরুষের ব্যভিচারের শিকার হলে তা নষ্ট হয় না এবং তৃতীয়, প্রেম রূপান্তরশীল অথচ চিরায়ত : প্রেমের বহুচারিতা প্রেমের অস্তিত্বের প্রমাণ।[১২]

অথচ ছবির দেহে মাতৃত্বের লক্ষণে জাহেদ পতিত হয় মনোবাস্তবতার জটিল স্তরে। অন্তর্দ্বন্দ্বে পতিত জাহেদ ভালোবাসায় স্বস্তি খুঁজে পেতে চেয়েছে–

> আমি ওকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললাম, সত্যি বলছি, কিছু মনে করিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি ভয়ংকর কিছু; কিন্তু পরে বুঝলাম, তোমার আমার ভালোবাসাটাই বড় সত্য।[১৩]

উপন্যাসের নায়ক জাহেদ ও তার স্ত্রী ছবির মনোজগৎ বিশ্লেষণের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এখানে জামিল ও মীরার সীমাবদ্ধ জীবন ও নাগরিক জীবনের জটিলতাকে মনস্তত্ত্বের অনুপুঙ্খ ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলেছেন। পারস্পরিক উপলব্ধিতে স্বতন্ত্র জীবন শুরু করার যে প্রত্যয় জামিল ও মীরার হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস জাগিয়েছিল তার পূর্ণতা ঘটেছে বিচ্ছেদে। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাসে প্রেমের সঙ্গে মানব মনস্তত্ত্বের উন্মোচন ঘটেছে, এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন–

> ১. নাগরিক জীবনের প্রেমের মূল্যবোধের বিনষ্টি ও বিকৃতি এই দুই ভিন্ন চিত্রের জীবনকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি চেতনায় আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।[১৪]

> ২. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র বিশ্লেষণমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস; কাহিনীর দীর্ঘায়িত ব্যাপ্তি, বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার, চরিত্রের বিচিত্রতা এখানে নেই। ছোটগল্পের উপাদান বিশ্লেষণ ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বক্রপথে টেনে নিয়ে উপন্যাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মানসিক-বিকৃতি ও মানসব্যাখ্যার সূক্ষ্ম-বুনানি উপন্যাসকে রুদ্ধ-নিশ্বাসী আকর্ষণ দান করেছে। মনোবিকলন চিত্র চিত্রিত হয়েছে যেসব উপন্যাসে, 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' তাদের মধ্যে অন্যতম। কাহিনির শেষাংশ অনাবশ্যকভাবে সম্প্রসারিত। তাই উপন্যাসের পরিণতি প্রাথমিক দ্রুততার অনুপাতে শ্লথগতি। জীবন-রূপায়ণে এবং কাহিনি-বিশ্লেষণে চমৎকারিত্বের অভাব ঘটলে এটা অসার্থক হবার আশঙ্কা ছিল। চরিত্রগুলো সজীব ও জটিল। শিল্পী জাহেদ, স্ত্রী ছবি, জামিল ও তার পত্নী এবং মুজতবা অন্তর্দ্বন্দ্বে সুতীব্র। ভাষা বিশ্লেষণাত্মক ও সাবলীল।[১৫]

---

[১২] *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[১৩] *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ১০০

[১৪] আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ১৯৩

[১৫] মনসুর মুসা, *পূর্ব-বাংলার উপন্যাস*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৯

তেইশ নম্বর তৈলচিত্রের জাহেদ-ছবি, জামিল-মীরার জীবনের দাম্পত্য, প্রেম ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাপিয়ে জাহেদের বন্ধু মুজতবার জীবনে প্রেম ধরা দিয়েছে আদিম কামনার অনুষঙ্গে। মুজতবা তার এই ধারণা থেকে জাহেদকে নিয়ে গেছে পতিতালয়ের রাধারানীর কাছে। মুজতবার দার্শনিকতা–

> কেন খুব খারাপ জায়গা নাকি! রসিকতা করে মুজতবা বলল, পতিতালয় প্রতিভার আঁতুড়ঘর, এটাই জানিসনে, কি ছবি আঁকবি?[১৬]

এখানেই শেষ নয়, মুজতবা তিনার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে ফাঁদে ফেলে তার সর্বনাশ করেছে। দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম গেলে জেনেছে তিনার বৃত্তান্ত, উপলব্ধি করেছে সত্য-মিথ্যার জগৎ, উপলব্ধি করেছে তিনার জীবন-উৎসর্গীয় প্রেম।

উপন্যাসের শিল্পমূল্য নিরূপণে প্লটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বৃহৎপটে এ উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে। জাহেদের করাচির দিনগুলো, কলকাতায় পড়াশোনারত দুই ভাই, জাহেদের খালার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে করাচিতে থেকে যাওয়া এসব মূল ঘটনা সহযোগে উপজাতীয় জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> উপন্যাসের শিল্পমূল্য নির্ধারণে প্লটের ভূমিকা অনেকখানি। উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছেন প্রচলিত নির্মিতিকে উপেক্ষা করে এক বৃহৎপটে। উপন্যাসে আধুনিক জীবন যেমন আছে, তেমনি আছে আঞ্চলিক পটে অঙ্কিত উপজাতীয় জীবনের চালচিত্র। প্লট তথা কাহিনি বিন্যাস, চরিত্রে তার প্রতিফলন ও চরিত্রচিত্রণে বৈচিত্র্য তাঁর উপন্যাসে সার্থকতা এনে দিয়েছে, কিন্তু ভাষার একমুখী বেগ ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার করতে পারেননি ঔপন্যাসিক।[১৭]

তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে প্রথাগত ফর্মের মধ্যে নব-আঙ্গিক নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা ও সংলাপে মুনশিয়ানা প্রদর্শন করলেও শিল্পরীতির বিচারে এ উপন্যাস দুর্বলতা এড়াতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খান লিখেছেন :

> চরিত্রচেতনা-অনুষঙ্গী ইম্প্রেশন ও সংলাপ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সন্দেহাতীত। তাঁর তেইশ নম্বর তৈলচিত্র শিল্পরীতির দিক থেকে দুর্বলতার সাক্ষ্যবাহী হলেও রং ও রেখার বিন্যাসে, সংযত ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহারে এবং চিত্ররীতির (Pictorial manner) সম্ভাবনা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য।[১৮]

---

[১৬] *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ২৯

[১৭] হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[১৮] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

ঔপন্যাসিক এখানে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ছবির বর্ণনা করেছেন উপমা সহযোগে :

> ছবির দেহে ভুবন ভোলানো রূপ ফুটে উঠেছে। ঠোঁট দুটো মেদুর-কোমল, গালে আপেলের রং চোখ দু'টোতে যেন স্বপ্নের ঘোর। কণ্ঠস্বর মিষ্টি মধুর, ধীরস্থির চলনে বিজয়িনীর অব্যর্থ গরিমা।[১৯]

এছাড়াও উপমার ব্যবহার লক্ষণীয় :

> নীলবিষের মতো কুটিল স্রোত। (পৃ. ৮৬)

ঔপন্যাসিকের দক্ষতা প্রস্ফুটিত হয়েছে প্রেম ও মনস্তত্ত্বপ্রধান এ উপন্যাসে অলংকারের সার্থক ব্যবহারে।

পাশ্চাত্য ফর্মের অনুসরণে রচিত *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাসে জাহেদ প্রচলিত সমাজের কূপমণ্ডূকতা ভেঙে হয়ে উঠেছে মুক্ত চেতনার মানুষ। ভাষার ব্যবহারে আলাউদ্দিন আল আজাদ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মনস্তত্ত্বের জটিল আবহে প্রেমোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হলেও মধ্যবিত্তের ভাষার ব্যবহার বেশি–তারই চিত্ররূপ দিলেন ঔপন্যাসিক।

> আকাশে পাখির মেলা, কিন্তু এ তো বর্ষাকাল মাত্র। বর্ষার পরে শরৎ, শরতের পরে হেমন্ত এবং তারও পরে বসন্ত। সে অনেকদিন, প্রায় তিন যুগেরই সমান। হাতজোড় করে বললাম, 'একটু দয়া করুন বৌদি। এত দেরী কেন। আগে হলে তো কোন ক্ষতি নেই!'
>
> 'ক্ষতি নেই! শিল্পীর বিয়ে ফাল্গুন মাসেই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি!'
>
> 'কিন্তু বৌদি, এ-যুগের শিল্পী তো সে-যুগের সভাসদ নয়, সে মূলত ট্র্যাজেডিরই কবি। তাই বর্ষাকালটাই তার বিবাহের উপযুক্ত সময় নয় কি?'[২০]

পাশ্চাত্য ফর্ম অনুসরণে এ উপন্যাসে মানব মনস্তত্ত্বের রহস্য উন্মোচনে লেখক অন্বিষ্ট হয়েছেন। উপন্যাসের ভাষা সাবলীল, ঝরঝরে, চরিত্র উপযোগী সংলাপ রচনার পাশাপাশি লেখক অলংকার প্রয়োগেও সিদ্ধহস্ততার প্রমাণ রেখেছেন। মাঝে মাঝে দর্শনতুল্য বাক্যও উচ্চারণ করেছেন। যেমন–'শিল্প মাত্রই অহংকারী এবং আত্মপ্রচারে উৎসাহী', 'বড় প্রেম শুধু স্বার্থপর নয় উদারও বটে', 'শাঁখের করাত আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।' বাক্য গঠনে লেখকের নিজস্বতা স্পষ্ট। কখনো ছোট ছোট বাক্যে, কখনো দীর্ঘ বাক্যে লেখক গল্প বলে যান। তবে, বেশিরভাগই ছোট বাক্যে বলেছেন, এতে বাক্যের টান টান উত্তেজনা বহাল থেকেছে।

---

[১৯] *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[২০] *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, ১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬০, নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৬৬

সর্বোপরি ভাষার ব্যবহার কাহিনির সুসংযত বিন্যাস, দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব, সময়ের সঙ্গে কাহিনির ঐক্য ও চরিত্র সৃজনে প্রেম ও মনস্তত্ত্বে শিল্পরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে এ উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক হিসেবে এখানেই তাঁর সাফল্য, এখানেই তাঁর বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য, ঔজ্জ্বল্যও।

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন আলাউদ্দিন আল আজাদের মনস্তত্ত্বধর্মী উপন্যাস। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে* ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অনুসন্ধানের যে প্রয়াস লক্ষণীয় তারই অনুরণন ঘটেছে। লিবিডো-তত্ত্ব সহযোগে মানব মনোজগৎ পর্যবেক্ষণে সচেষ্ট ঔপন্যাসিকের একান্ত অভিনিবেশ লক্ষ করা যায় এ উপন্যাসে। নিজ কন্যা পারভীনের স্বামী হিসেবে কামালকে নির্বাচিত করেছেন বিলকিস। অতঃপর এই কামালকে আশ্রয় করেই বিলকিসের অবদমিত যৌনচেতনার স্বরূপ রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। কামালের প্রতি বিলকিসের যৌনচেতনার প্রকাশ ও স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতার রূপায়ণে আজাদ ফ্রয়েডীয় দর্শনের শরণাপন্ন হয়েছেন। বিলকিসের বিকৃত মানসিকতার নেপথ্যে অচরিতার্থ দাম্পত্যের ভূমিকাকেও দায়ী করা যেতে পারে। বিলকিসের অন্তর্বাস্তবতা ও কামনাতাড়িত নিঃসঙ্গ জীবনের রূপায়ণে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব প্রয়োগে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই উপন্যাসে নিঃসঙ্গ বিলকিস বানু কামালের স্পর্শে নিজেই এক অপ্রতিরোধ্য যৌনচেতনায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। লিবিডো তাড়না ও সুপার ইগোশাসিত মনোজাগতিক অন্তর্বাস্তবতায় বিলকিসের হৃদয় পীড়িত হয় অপ্রাপ্তির দোলাচলে।

> পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও আবেগসমূহের সমষ্টি হিসেবে কোন একটি লোক যখন একইভাবে গঠিত অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধ হয়, তখন তার ব্যক্তিত্বে উপাদানগুলির পরিবর্তমান বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বহির্জীবনের চেয়ে অন্তর্জীবনের গুরুত্ব বেশি এবং কোন এক ব্যক্তির অভ্যন্তরে পরস্পর বিরোধী উপাদানসমূহের যে সংঘাত চলছে সেটা বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাতের চেয়ে বেশি প্রকট।[২১]

বিলকিস বানু এই অন্তর্দহনে দগ্ধ হয়েছেন প্রতিনিয়ত। পারভীনের সঙ্গে কামালের গোপন অভিসারের খবরে সে নিজেকে রিক্ত, বেপরোয়া করে ফেলেছেন। কামাল-পারুর যৌনসঙ্গমের মাঝে নিজে হাজির হয়েছেন। পারু সেজে তিনি কামালের সঙ্গ পেতে চেয়েছেন :

> বিলকিস সরে পড়তে চাইলেন; কিন্তু পা আটকে গেছে মেঝের সঙ্গে, শিরশিরিয়ে কাঁপছেন শুধু। কামাল কপাট দুটো ফাঁকা করেই ঝড়ের বেগে এগিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ঝুঁকে পড়লেন।[২২]

---

[২১] রণেশ দাশগুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

[২২] *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পৃ. ১১৫

কামালের প্রতি পারুর ভালোবাসা, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ফলে বিলকিস বানুর যৌনাবেগ জাগ্রত হয়েছে। ভালোবাসাহীন যৌনতার টান পুনরায় ফিরে এসেছে। বিলকিস বানুর মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রাতের আঁধারে কামালের কাছে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন বিলকিস।

> মশারির প্রান্তটা ধরে আস্তে আস্তে শিয়রের ধারে বিছানায় বসতে হবে; এরপর মুখের কাছে ঝুঁকে মাথার চুলে আদর করা। এতেই যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে কোন বিপত্তির আশঙ্কা নেই; তৎক্ষণাৎই পরিচয়টা দিয়ে শান্ত থাকতে হবে বললেই হলো। আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব, নবীন দেবতা, আমাকে তোমার দানে ভরিয়ে তোলো। আমাকে শ্রান্ত করে চোখ বুজিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমাকে শান্ত করে দাও।[২৩]

বিলকিস বানু যেন পৌঁছে গেছে শীতের শেষ রাতে, অপর দিকে কামাল ও তার কন্যা পারভীন ওরফে পারুর যৌনতা যেন আগমনী গানের মতো। বিলকিস বানু মেনে নিলেও প্রচণ্ড অন্তর্দন্ধে হৃদয় তার হয়ে উঠেছে বিষাদময়। মনসুর মুসা লিখেছেন :

> কামাল আর পারভীনের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠুক, এটা তার কাম্য। কিন্তু কামালকে দেখে তার সুপ্ত অতৃপ্ত কামনা জেগে ওঠে। নিজের সুপ্ত কামনার জাগরণ এবং একটি বিচিত্র অনুভূতির শিহরণ বিলকিসের দেহে আর মনে। এই বিচিত্র জটিল মানসিকতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এ উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে।[২৪]

বিলকিস বানুর কামোন্মাদনার আরোপণ মূল পদ্ধতি প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মর্তব্য :

> ঔপন্যাসিকেরা পদ্ধতির পর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকে এক এক করে, তখন সাহিত্য মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। এত বেশি ঘনিষ্ঠ যে সেগুলো দেখলে মনে হয়, এসব উপন্যাস লেখাই হয়েছে মনস্তত্ত্ব ও মানস শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য।[২৫]

এ উপন্যাসে বিষয় অনুযায়ী চরিত্র এবং ভাষা প্রয়োগে, বর্ণনার অভিনবত্বে, স্বগত কথনরীতির ব্যবহার প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

> না, না, আর নয়, আর দ্বিধা নয় আর সংকোচ নয়। তিনি দেবেন, সব দেবেন। সকল পলায়নের আড়াল থেকে তুলে নিজেকে উন্মুক্ত করে ধরবেন। হাত ধরে নিয়ে চৌকির ধারে বসালে টেনে নেবেন কোলের ওপর। মাথার চুলে আদর করতে থাকবেন। হাত বুলিয়ে, এরপরও চাইলে ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে মিশে থাকবেন।[২৬]

বিলকিসের নিঃসঙ্গতাড়িত দীর্ঘশ্বাস রূপায়ণ করেছেন ঔপন্যাসিক মানব মনের অন্তর্গত স্বগত কথনরীতির আলোকে :

---

[২৩] *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পৃ. ১৩৬

[২৪] মনসুর মুসা, *পূর্ব-বাংলার উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

[২৫] রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

> জন্মের পরে শৈশব, শৈশবের পরে কৈশোর, কৈশোরের পরে যৌবন, যৌবনের পরে প্রৌঢ়ত্ব, প্রৌঢ়ত্বের পরে বার্ধক্য, বার্ধক্যের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে সমাধি, সমাধির পরে পরলোক; পরলোকের পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে বিচার, বিচারের পরে স্বর্গ, না না স্বর্গ নয়, স্বর্গ নয় নরক, অনন্ত নরক যাই হোক, এই একটি চুম্বনের যেন সমাপ্তি না ঘটে।[২৭]

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন উপন্যাসের চরিত্রায়ণে ঔপন্যাসিক প্রযুক্ত করেন অভিনব কৌশল। কামাল ও পারুকে গৌণ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে বিলকিস বানুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম-কামনা ও মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন।

> বিলকিস বানু যেন নিঃসঙ্গ পাতা শুকিয়ে যাওয়া ঐ ঝাউগাছটির মতোই একা।[২৮]

আধুনিক নাগরিক জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রেম কিংবা মনস্তত্ত্বের জটিল অন্তর্বয়ন উপন্যাসকে বিষয়ের গভীরতা ও জীবন দৃষ্টির প্রেক্ষাপটে সংকীর্ণতা থাকলেও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রয়োগে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণের সফলতা পেয়েছে। *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ মনোজাগতিক অন্তর্বাস্তবতা ও যৌনাবেগ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব শিল্পীরীতির বাহক হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খান লিখেছেন :

> প্রচলিত ফর্ম-অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন মনোসংকট ও মনোবিশ্লেষণের নৈপুণ্যে আঙ্গিকগত অভিনবত্ব অর্জন করেছে।[২৯]

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন উপন্যাসে বিলকিসের অবরুদ্ধ যৌনাবেগের অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উন্মোচনে ঔপন্যাসিকের সংযম ও সংহতি বিস্ময়কর। রতিবাসনা (libido) ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্বক্ষত পরিস্থিতির চাপে বিলকিসের অন্তর্গত রক্তপাতকে বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যায় উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। এ উপন্যাসে বিলকিস বানুর অপস্রিয়মাণ যৌবনের ঝরা পাতার মর্মর এভাবেই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসের শুরুতে ইম্প্রেশন এবং চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতি উপন্যাসের মৌল সত্যকে উন্মোচিত করেছে :

> কুয়াশা জমে না; কিন্তু পশ্চিম আকাশে কুয়াশার মতো একটা ধোঁয়াটে আবরণ ফ্যাকাশে করে তোলে গোধূলির রং। সারা ঘরে ছায়া ছায়া পরিবেশ তাই জানালার ওপরে আয়নাটা রেখে কালো হাড়ের মোটা কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন বিলকিস বানু, তার মুখটাও পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। আয়নার ভেতরে তিনি দেখেন নিজেকে, ভুঁরু দু'টো বাঁকা, টানা টানা চোখ এবং চোখের পুতুলি কালো; গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েনি এখনো, চুল এখনো

---

[২৭] *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ১৩৪

[২৮] *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পৃ. ১৩৫

[২৯] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

কোমরের কাছে গিয়ে পড়ে। সাঁইতিরিশটি বছর কম নয়, বিশেষত এদেশের মেয়ের জন্য; কিন্তু এখনো একটি চুলেও পাক ধরেনি। বুকের ভিতরে কি একটা অনুভূতি রিনরিনিয়ে ওঠে, সিঁথি কেটে দু'ধারে চুলগুলো পাট করে ছেড়ে দিলেন।[৩০]

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন-এ ঔপন্যাসিক মানব মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের বর্ণনা শিল্পরীতির আলোকে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে বিলকিস বানু ও পারুর জীবনে কামনাকে নিয়ে যে যৌনাবেগের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে তা আধুনিক নাগরিক জীবনে দুর্লক্ষ্য নয় বরং সমাজের বাস্তবানুগ চালচিত্র এ উপন্যাস। চরিত্রায়ণ কৌশলের সঙ্গে কাহিনির সুষম বিন্যাস, পরিচর্যারীতি, দৃষ্টিকোণ এসবের সার্থক ব্যবহার ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সফল প্রয়োগে শিল্পসাফল্য লাভে সার্থক হয়েছে এ উপন্যাস।

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন

আলাউদ্দিন আল আজাদ পাশ্চাত্য অনুধ্যায়ী শিল্পী। তাঁর কথাসাহিত্যে স্বভাবতই পাশ্চাত্যরীতির প্রতিফলন ঘটেছে। *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* উপন্যাসে তিনি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের সঙ্গে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে মার্কসবাদী সাম্যবাদের ধারণা প্রযুক্ত করে শিল্পসফল উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জ্যোৎস্না যার সার্টিফিকেট নাম প্রফেসর ডাক্তার মমতাজ জাহান বেগম, এমবিবিএস। গল্পকথক সালমা যার মাধ্যমে জ্যোৎস্নার সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে ঘটনা অগ্রসর হয়েছে পরিণতির দিকে। জ্যোৎস্নার মনোবিশ্লেষণে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বের প্রয়োগ নিরীক্ষণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সেই সঙ্গে মার্কসীয় শ্রেণিহীন সমাজের উপলব্ধিজাত মানসিকতা প্রযুক্ত হয়েছে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে। *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* উপন্যাসের প্রধান বিষয় জ্যোৎস্নার সঙ্গে পাশবিক আচরণকারী ভালোবাসাহীন যৌনতার মুখোশ উন্মোচন। এ উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায় ঔপন্যাসিক প্রকাশভঙ্গির সহায়ক খোলামেলা শব্দ ও বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। একজন নারীর জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সত্যান্বেষী রূপায়ণে লেখক প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজ মানসে ঘটে যাওয়া ঘটনার অনুপুঙ্খ রূপায়ণে লেখকের দক্ষতা প্রশংসনীয়। লেখক এক্ষেত্রে , সমাজের প্রচলিত ঘটনাংশের আলোকে প্লট নির্বাচন করেছেন। এ উপন্যাসটি জ্যোৎস্নার জীবনালেখ্য। কখনো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে, কখনো প্রেক্ষণবিন্দুতে অবস্থান করে উপন্যাসের আদন্ত জ্যোৎস্নার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন ঔপন্যাসিক। পিতৃসম ডাক্তার জাফর অনুকূল পরিবেশে জ্যোৎস্নাকে ভোগ করেছেন। ধারালো চকচকে ছুরির ভয়

[৩০] *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পাইওনিয়ার, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ১

দেখিয়ে জাফর উপনীত হয়েছেন প্রেমহীন পাশবিক যৌনতা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে। প্রেমহীন পাশবিকতার এ কদর্যরূপ জ্যোৎস্নার অন্তর্বাস্তবতার প্রশ্নের উদ্রেক করেছেন। জ্যোৎস্না বলেছে :

> ১. আসলে কোন্‌টা বাস্তবতা এবং সত্য? সমাজের বাইরে যে চৌকশ ঘষামাজা রূপ, সেটা না আচ্ছাদনের ভিতরে যে আদিমতা?
>
> মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমবিবর্তনের ধারায় তার বাড়তি আনুষঙ্গিক অর্জন-মানুষ সর্বতোভাবে এখনও পশুত্বের স্তরেই আছে।[৩১]
>
> ২. একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম বলেই, যদিও সর্বদাই আমি নৃশংস নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি তবু আজকে পিছনে ফিরে তাকালে কোনো দুঃখ হয় না, আফসোস হয় না।[৩২]
>
> ৩. রীতিমতো শিক্ষিত ভদ্রলোক, যেই দেখত সম্মান করতো, সেই প্রবীণ লোকটা সুযোগ পেয়ে আমাকে রেপ্ করল।[৩৩]

নারীর মনস্তত্ত্ব, কামজ প্রভাব ও চরিত্রে অন্তর্জাগতিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে জ্যোৎস্না চরিত্রের উপলব্ধিতে :

> ১. যে কোন একজন নারীর মনস্তত্ত্ব বিচিত্রমুখী ও জটিল; তার মধ্যে জোয়ারভাটাও আছে। আকর্ষণে একনিষ্ঠতা তার প্রকৃতির বিরোধী। একজনকে ধরে যে ঝুলে থাকে তার বাস্তব প্রয়োজনে।[৩৪]
>
> ২. তার সুন্দর মুখশ্রী এবং যৌবনভারনত অঙ্গপ্রতঙ্গ কামোদ্দীপক : মধুলোভে মৌমাছিরা যেমন ফুলের কাছে ভিড় করে তেমনি এর আকর্ষণেই আসে বিভিন্ন চরিত্র।[৩৫]

এ উপন্যাসে নারীর প্রেমে বিচিত্রমুখিতার স্বরূপ উন্মোচনে সচেষ্ট ঔপন্যাসিক। *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসের যৌনজীবনে অসুখী বিলকিস বানুর অনুগামী চরিত্র এ উপন্যাসের লজিক আপা ফেরদৌস আরা এবং জ্যোৎস্নার মা উলফাত বানু। অচরিতার্থ দাম্পত্য সুখের প্রত্যাশী এরা ফ্রয়েডীয় চেতনায় সমর্পিত হয়েছে আপাত সমাজবিরুদ্ধ কিন্তু প্রেমপূর্ণ যৌনতায়। কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরে নিজের মাকে ডাক্তার জাফরের সঙ্গে দেখে জ্যোৎস্নার হৃদয়ে যে অন্তর্দাহ, মনোজাগতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা প্রকাশিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে ভিতরে তাকিয়েই চক্ষু ওর চড়কগাছ। এও কি সম্ভব! এ এক দুঃস্বপ্ন, না সত্য?[৩৬]

---

৩১ *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে চরিত্রায়ণে পারম্পর্য দেখিয়েছেন। শুধু পুরুষ চরিত্রই নয় বরং নারী চরিত্র, যৌন বিকার, কামোত্তেজনা নবজন্মলাভকারী মানব শিশু, সবার কাছে মনস্তত্ত্বের জটিলতার বাণী পৌঁছে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> ঔপন্যাসিক শুধু পুরুষ চরিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, স্ত্রী চরিত্রেও এনেছেন যৌনবিকার, কাম-উত্তেজনা, জ্যোৎস্নার মা উলফাত বানু এবং ওর কলেজ জীবনের লজিক আপা ফেরদৌস তার উদাহরণ। শুধু এরাই নয় জ্যোৎস্না নিজেও কাম-উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়েছে, ডাক্তার জাফর ও উলফাত বানুর আলিঙ্গন ও শৃঙ্গার দেখে।[৩৭]

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন উপন্যাসে আজাদ বিচিত্র মানব মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ফ্রয়েডীয় যৌনতায় সচেতন এরা সমকামী; নারীকে ভোগের বস্তু করেছে। প্রেমের সঙ্গে কামজ প্রভাবের যে বিস্তৃতি তার সঙ্গে বলপূর্বক যৌনতায় আচ্ছন্ন সমাজ মানসের প্রতিরূপক এ গল্প। এ উপন্যাসের শেষে জ্যোৎস্নার প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* উপন্যাসের শেষে যৌনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনায় বলীয়ান নারীর প্রতিবাদ ফুঠে উঠেছে :

> পুরুষের লাম্পট্যের বিরুদ্ধে নারীর প্রতি অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।[৩৮]

আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উপন্যাসে সমাজে বসবাসরত আধুনিকতামনস্ক নারীর বাস্তব চিত্র যেমন উপস্থাপন করেছেন তেমনি আবার ভাষা প্রয়োগে তিনি অত্যন্ত খোলামেলা সংলাপ ব্যবহার করেছেন যাতে সংযম রক্ষিত হয়নি। সর্বোপরি এ উপন্যাসে মানব মনস্তত্ত্ব ও তাঁর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রেম ও কামজ প্রভাবে নারীর গর্ভে যে শিশু জন্মলাভ করে, সে শিশু যে অবৈধ হতে পারে না, এমন সত্যের ইঙ্গিতবাহী এ উপন্যাস সার্থকতায় উন্নীত হয়েছে।

অনূদিত অন্ধকার

অনূদিত অন্ধকার উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে মিতুনকে নিয়ে লিংকনের স্মৃতিভাষ্যে। এ উপন্যাসে আধুনিক উচ্চবিত্ত জীবনের জটিলতা, নৈঃসঙ্গ্য ও অর্থলিপ্সু মানসিকতার বিপরীতে প্রেমের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। ধনী পরিবারের সন্তান লিংকন চিকিৎসাসূত্রে হাসপাতালে অবস্থানকালে নার্স মিতুনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মিতুনের মূল নাম রুখসানা আহমদ। তাকে সবাই মিতুন নামেই চেনে। এ উপন্যাসে কাহিনির বিস্তার মিতুন ও লিংকনের প্রেম, সংসার ও বিচ্ছেদের সূত্র ধরে। বিয়ের প্রথম পর্যায়ে তাদের

---

৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৩৭ হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, পৃ. ২৩১

৩৮ *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

পারস্পরিক উপলব্ধি, সন্দেহ তাদের পথচলাকে ব্যবহৃত করে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে নিমজ্জিত করে। নার্স মিতুনের সঙ্গে ডাক্তার সালামের প্রণয়াবেগের যে অভিযোগ লিংকনের আত্মোপলব্ধিতে প্রকাশিত হয় তার পশ্চাতে লুকায়িত গভীর প্রেম ও মিতুনকে হারানোর ভয়। লিংকনের সন্দেহ ডাক্তার সালাম কবিরের সঙ্গে মিতুনের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। এ সন্দেহ থেকে লিংকন বলেছে :

> তুমি আর সালাম। তুমি আর সালাম অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ। নাইট ডিউটি তোমার। তোমার প্রতিরাতের অভিসার–![৩৯]

লিংকনের সন্দেহতাড়িত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকাশে লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্যকে স্মরণ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উপস্থিত হয়েছে লিংকনের আত্ম-উপলব্ধিজাত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার স্বরূপ :

> ১. পুরনো ওথোলো ঈর্ষাবশে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তমা ডেসদোমোনাকে হত্যা করেছিলেন, আমি ঈর্ষাবশে তোমাকে হত্যা করেছি। আমি নতুন ওথেলো।[৪০]
>
> ২. কোত্থেকে পেলাম এই দূষিত উন্মাদনা, কোত্থেকে পেলাম? নিশ্চয় তা আমার রক্তে মিশ্রিত ছিল।[৪১]

লিংকনের অন্তর্বাস্তবতা প্রকাশে ঔপন্যাসিক মানব মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রবণতাসূত্রে অগ্রসর হয়েছেন। লিংকনের খালা নাশিদের প্রতি তার পিতার যে প্রণয়াবেগ এবং অচরিতার্থ যৌনতার অনুপ্রেরণায় প্রতিহিংসাপরায়ণতার যে স্বরূপ ডায়েরির সূত্র ধরে উন্মোচিত হয়েছে তা লিংকনকে মনস্তত্ত্বের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নিক্ষেপ করেছে। ডায়েরিতে লিখিত বক্তব্য :

১. নাশিদকে আমি অন্য পুরুষের পাশে দেখতে পারবো না। অসম্ভব, অসম্ভব। তবে উপায়? একটি উপায় আছে, হ্যাঁ কেবল একটি।[৪২]

২. যা ঘটার ছিল তাই ঘটেছে। ওর কক্ষের কপাট ভেজানো থাকত, গভীর রাতে সন্তর্পণে গিয়ে ওকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।[৪৩]

অনূদিত অন্ধকার উপন্যাসে পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার সূত্রে বহনকারী মানুষের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। আজন্ম হত্যার যে মানসিকতা লিংকনের পিতা থেকে শুরু করে লিংকনের মধ্যে প্রবাহিত তাতে লিংকন জটিল মানসিক সমস্যায় পতিত হয়। প্রচণ্ড ক্ষোভে, ঘৃণায় পিতার ছবিতে গুলি করে লিংকন :

---

৩৯ *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

প্রতারক! দাঁতে দাঁতে উচ্চারণ করে বন্দুকের নল উঁচিয়ে গুলী করতে লাগলাম। গুলীর পর গুলী। গুলী আর গুলী। ঝাঁজরা হয়ে গেল। তারপর সশব্দে নিচে পড়ল।[৪৪]

এ উপন্যাসে কাহিনি বর্ণনা সরলতার পথ বেয়ে মনস্তত্ত্ব ও ফ্রয়েডীয় চেতনার প্রযুক্তে অগ্রসর হয়েছে অন্তর্বাস্তবতার অভিমুখে। লিংকনের বর্ণনায় মিতুনের সঙ্গে কাটানো সময়গুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসে। লেখক এ উপন্যাসের মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালির* ভূমিকাংশে বর্ণিত বক্তব্যের অনুগামী তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এ উপন্যাসে ভাষা ও চরিত্রায়ণ কৌশলে আজাদের কৃতিত্ব প্রশংসার দাবিদার। এ উপন্যাসে জটিলতার চিত্র, নানারূপ অসঙ্গতি, নাটকীয়তা, জীবনের করুণ পরিণতি লক্ষ করা যায়। মিতুন-লিংকন আখ্যানই এ উপন্যাসের প্লট হিসেবে স্বীকৃত। এর বাইরে ডায়েরি উন্মোচন প্রসঙ্গে লিংকনের পিতার সমাজ-বহির্ভূত প্রেমের পরিণামে হত্যাকারী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রচেষ্টা ও শেষ পর্যন্ত সমুদ্রপাড়ে মানব সেবার নিমিত্তে যাওয়ার বর্ণনা দিয়ে কাহিনির যবনিকাপাত ঘটেছে।

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে রাজু, সুজা ও সুজার বোন জাহানারা ওরফে জাহানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। প্রেমের ব্যর্থতাবোধ-উদ্ভূত শূন্যতা, রাজু কর্তৃক জাহানের সঙ্গে প্রতারণাপূর্ণ প্রেমের সম্পর্ক ও পরিণামে অন্য নারীর সঙ্গে বিয়ে এসব ঘটনা সুজা ও তার বোন জাহানের মনস্তত্ত্বে যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে তারই চিত্রায়ণে সচেষ্ট ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে রাজু-জাহানারা আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে সুজা-দিলরুবার প্রেম-বিরহ ও জটিল অন্তর্বাস্তবতাময় ঘটনাপুঞ্জ উপ-আখ্যান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। প্রেমের ব্যর্থতায় নৈঃসঙ্গ্যে নিপতিত সুজার অন্তর্বাস্তবতাময় উপলব্ধি :

১. হতে পারে এ আমার মনোবিকার। কিংবা অতিশয় স্পর্শকাতরতা। কিন্তু যাই হোক, আমার ভিতরের অবস্থাটা প্রকাশ হওয়া ঠিক নয়।"[৪৫]

২. এ কি স্বপ্ন না বাস্তব? একটুখানি রেশের মতো মনে হলো এটা স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত তন্ময়তা।"[৪৬]

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুজা। তার জীবনকাহিনি, সংগ্রাম, পথ চলার বন্ধুর পথের বর্ণনা রয়েছে। সুজার নিঃসঙ্গ জীবনের বাস্তবচিত্র যা পরবর্তী সময়ে বন্ধু রাজুর সহযোগিতায় পরিবর্তিত হয়। বন্ধু রাজুর পৃষ্ঠপোষকতায় সুজা সেলসম্যান থেকে হয়েছে পাবলিসিটি অফিসার। সুজার বোন জাহানারার সঙ্গে রাজু

---

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৪৫ *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ২৪৪

৪৬ *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ২৪৫

প্রতারণাপূর্ণ প্রেমের পরিচয় পেলেও রাজু কর্তৃক চাকরি পাওয়ার কারণে সুজা এ বিষয়ে প্রতিবাদী হতে পারেনি। একদিকে বোন অন্যদিকে বন্ধু রাজু, উভয় সংকটে পতিত হয়েছে সুজা। রাজুর প্রতারণায় অন্তর্দহনে প্রেমহীন অপ্রাপ্তি যা বোন জাহানারা ভোগ করেছে, তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সুজা অবচেতনে গভীর অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করেছে :

> বাইরে নিবিড় অন্ধকার, অনেক রাত যেন হয়ে গেছে। তারকাখচিত গভীর অন্তরীক্ষ, আর আমি হেঁটে চলেছি বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে। অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াই। একটি সবুজ গাছের গুঁড়িতে একজন নারী, মনে হল, যুবতী।[৪৭]

জাহানারার জীবন জটিল মনোবাস্তবতার চিত্রায়ণে ঔপন্যাসিকের পরিচর্যা সদর্থক চিন্তার পরিচয়বাহী। অবচেতন সত্তায় জাহানারা ঘুমের ওষুধ খেতে উদ্যত হলেও মানবিকবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সে রাজুর সুখের মধ্যে নিজের আত্মতুষ্টি অর্জনে প্রবৃত্ত হয়েছে। উপন্যাসে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন, চিত্রকল্প ব্যবহারে সার্থকতা দেখিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতাময় উপলব্ধির প্রকাশই এ উপন্যাসের প্রধান বিষয়। ব্যর্থতাবোধ থেকে জাগ্রত অপ্রাপ্তির সঙ্গে অবচেতন সত্তার প্রয়াসে চরিত্রের উপলব্ধি অলংকার সহযোগে উপস্থাপিত হয়েছে :

> অতি বেগুনি বর্ণালির অনন্ত নিবিড়তায় আঁকাবাঁকা সার বাঁধা মহীরুহশ্রেণী পুঞ্জ পুঞ্জ সচল জোনাকীতে ঝিক্ ঝিক্ করছিল যখন তার ছায়াপথে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মধুর চিকন কণ্ঠস্বর। আমি থমকে দাঁড়াই পিছন থেকে দৌড়ে আসে গোলাপী ঘাগরাপরা গুচ্ছ গুচ্ছ কেশবতী একটি কিশোরী!"[৪৮]

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি উপন্যাসে মধ্যবিত্তের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণে শিল্পমানে উত্তীর্ণ হয়েছেন ঔপন্যাসিক। সুজা, জাহানারা দুই ভাই-বোন–এরা নগর জীবনের প্রেম ও জটিল মনস্তত্ত্বের পরিণতিতে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েছে। সুজা ও জাহানারার প্রেম ও মনস্তত্ত্বের যে জটিল সংঘাত তা পরিণামে অন্তর্দহনে পতিত হয়েছে। রাজুর উপস্থিতি জাহানের হৃদয়ে প্রেমবীজ বপন করলেও বিকশিত হতে পারেনি রাজুর কূটকৌশলের কারণে। প্রেমের জটিল মনস্তত্ত্বের উপন্যাস হিসেবে *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* শিল্পমানে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসগুলোতে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে মানব মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে ঔপন্যাসিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণে ব্যবহৃত উপমার মধ্য দিয়ে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ বর্ণিত হয়েছে :

---

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৪৮ *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ২৪১

১. কোমল কোরকের মধ্যে পদ্মের মতো ওর নিটোল দেহখানি নিবিড় সৌরভে ঘেরা। *(তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৭১)

২. দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে বেগুনী মেঘের মতো। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ১০৭)

৩. বিলকিস নিঃসঙ্গ, পাতা শুকিয়ে যাওয়া ঐ ঝাউগাছটার মতো একা। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ৭)

৪. লোকটা ছিল অতৃপ্ত অসহায় বোবা পশুর মতো, যৎসামান্য আদর দিলেও পায়ের কাছে গোলাম হয়ে থাকত। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ১৬)

৫. যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি উলঙ্গ হলাম; তারপর প্রেতাত্মার মতো ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগলাম। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ১২৩)

৬. এদিকে বেড়ার এ পাশে জ্যোৎস্নার শরীরে তড়িৎ প্রবাহের মতো শিহরণ খেলে যাচ্ছে, মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ১২৯)

৭. এখন আমার ভিতরে একটা সন্দেহ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, যা হয়তো অমূলক। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ২৪২)

৮. ওর চরিত্রে মনে হয় এমন একটা জিনিস আছে, যা সুতীক্ষ্ণ ছুরির মতো। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ২৫৮)

৯. ঝড়ের পাখির মতো বাড়ি খেয়ে ফিরে আসে। (*অনূদিত অন্ধকার*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ২০০)

১০. উনি ঝট করে আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং গোখরোর মতো ফুঁসে উঠলেন। (*অনূদিত অন্ধকার*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পৃ. ১৮৮)

আজাদের উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে ভাষারীতি ও সংলাপ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বিষয় ও স্থানের প্রেক্ষিতে সচেতনতা লক্ষণীয়। ইংরেজি বহুল সংলাপ উপস্থিতি কখনো কখনো লক্ষ করা যায় :

১. ভেরি গ্লাড টু মীট ইউ! প্রসাধন-করা মুখ, একজন প্রৌঢ়া মহিলা বললেন, স্যার, উইল ইউ হ্যাভ এ কাপ অব টী উইথ মী এ্যাট মাই হোম? [*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ১-২]

২. সো ফার আইন রিমেম্বার, অয়েল পেইন্টিং নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি, ইজ নট অনলি এ গুড পীস অব আর্ট, বাট অলসো ভেরি নিয়ার টু এ মাস্টারপীস! [*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ১]

৩. জ্যোৎস্না, ইউ আর এ্যান ইনটেলিজেন্ট গার্ল এ্যান্ড চেরিটেবল ট্যু! [*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১০২]

৪. অল রাইট ইফ ইউ ওয়ান্ট এ চাইল্ড নাও ইউ টেক এনাদার ওয়াইফ, আই স্যাল হ্যাভ নো অবজেকশন! [*অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ১৯৪-৯৫]

৫. বাংলাদেশ ইজ নট এ বটমলেস বাসকেট। রাদার ইটস্ এ গ্রেট কাসকেট। [*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৫১]

এছাড়াও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায় চরিত্রের মুখ থেকে *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* উপন্যাসের জাহানারা ও সুজার কথোপকথনে :

রাজু তোকে বিয়ে করেনি বলে তুই আত্মহত্যা করতিস! করতাম। [পৃ. ২৭৬]

আলাউদ্দিন আল আজাদ পঞ্চাশের দশকে কথাসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করলেও তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার জাগরণ ষাটের দশকে। প্রথম উপন্যাস *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* প্রকাশিত হয় ষাটের দশকে। এরপর *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*। এই দুটি উপন্যাসে যৌনচেতনা, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণ বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *অনূদিত অন্ধকার*, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* উপন্যাসগুলোতে মানব মনস্তত্ত্ব, জটিল অন্তর্বাস্তবতা রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন ঔপন্যাসিক। আলাউদ্দিন আল আজাদ *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাসে প্রচলিত ফর্ম ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন প্লট (Plot) উন্মোচনে বাংলাদেশের উপন্যাসে নতুন পথ তৈরি করেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আজাদ সম্পর্কে লিখেছেন :

> আমাদের সংস্কৃতি জগতে এখন যে প্রাণস্পন্দন দেখা যায়, বহুসংখ্যক মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যায়, পঞ্চাশের দশকে তা ছিল না। অন্যদের জন্যে পথ কেটেছেন যাঁরা, তিনি অগ্রণী তাঁদের মধ্যে।[৪৯]

ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনার আলোকে মানব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও মার্কসের সমাজচেতনার দ্বারা আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রভাবিত ছিলেন। ব্যক্তির অন্তর্বাস্তবতা প্রকাশে আজাদ ছিলেন সদা তৎপর। আজাদের কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত নর-নারীর জীবনে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পসম্মত প্রকাশভঙ্গি তাঁকে শ্রেষ্ঠতার আসনে স্থান দিয়েছে।

[৪৯] সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.), *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন-সাহিত্য*, বাতায়ন প্রকাশ, ২০২৩, পৃ. ৩১

আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ

ছোটগল্প কথাসাহিত্যের সবচেয়ে অর্বাচীন শাখা। উপন্যাসের চক্রপ্রবাহের মধ্যে জীবনের চিত্র রূপায়িত হয় এবং পাঠক হৃদয়ের পূর্ণাঙ্গতার উপলব্ধি জন্ম নেয়। অন্যদিকে সভ্যতার বিকাশে যন্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট জীবনদর্শনের জটিলতা যখন মানব কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে তুলেছে, তখনই শিল্প-সাহিত্য জগতে ব্যক্তিজীবনের অনবসর ও ব্যস্ততা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ছোটগল্প। অর্থাৎ জীবন প্রবাহের প্রতিটি স্পন্দনের যে কৌতূহলবোধ তার থেকেই জন্ম ছোটগল্পের। ছোটগল্পে প্রতিফলিত খণ্ড ঘটনাংশকে সমগ্র জীবনের ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করার মধ্যে ছোটগল্পের সার্থকতা নিহিত। আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন প্রবাহের পরিবর্তনের আলোকে ছোটগল্পে প্রকরণশৈলীকে শিল্প সার্থক করে তুলেছেন। ছোটগল্প প্রসঙ্গে আজাদের মন্তব্য :

> ছোটগল্পে আমরা ছোট্ট পরিসরে জীবনের বড় পরিচয় পাই, যা একাধারে অভিজ্ঞতা ও শৈলী, বাস্তবতার রূপায়ণ ও শৈল্পিক সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্ভাবনাও এখানে বেশি।[৫০]

আলাউদ্দিন আল আজাদের সাহিত্য জীবনের শুরু (১৯৪৫ থেকে ১৯৫২) পর্যন্ত। তিনি কাহিনি-নির্ভর গল্প রচনা করেছেন। অন্যদিকে–

> ষাটের দশকে তিনি গহনচারী শিল্পী : লিবিডোতাড়িত কামনা বাসনার রূপায়ণে অধিক উৎসাহী।[৫১]

তাঁর এ পর্বের গল্পগুলোতে মানব মনের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচন তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একটি স্বাধিকার ও রাজনৈতিক চেতনাধারার গল্প এবং অন্যটি মানব মনের বিচিত্ররূপ, গভীরতা ও বিস্তারসহ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের আলোকে মানব মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন সংক্রান্ত ছোটগল্প। লেখক আজাদ পঞ্চাশের দশকের কথাসাহিত্যিক হলেও তাঁর গল্পে ষাটের দশকে শিল্পী ভাবনার বাঁক বদল ঘটে। বৈচিত্র্যময় প্রকরণশৈলীর অন্বেষণে মার্কসিজম থেকে ফ্রয়েডে ধাতস্থ হয়ে সমাজের বিচিত্রতাকে মনস্তত্ত্বের আলোকে ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছোটগল্পে ঘটনা, মনস্তত্ত্ব বা চরিত্রায়ণ কৌশলের আলোকে সংকটময় চিত্র দেখানোর ক্লাসিক পদ্ধতির বিপরীতে আধুনিক ছোটগল্প মানুষের অন্তর্বাস্তবতা বা ব্যক্তির উপস্থিতিই সর্বত্র। কাহিনি বা ঘটনাংশের

---

[৫০] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *সাহিত্য ভাষা ও শিল্পীর দায়বদ্ধতা*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৯৬

[৫১] শিল্পী খানম, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে জীবনবোধের রূপ-রূপান্তর*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৬

উপস্থিতি নেই বললেই চলে। আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উভয়বিধ প্রকরণবিশিষ্ট গল্প রচনা করেছেন। কথাসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ হলো মানুষ ও তাঁর স্থানিক ভাষা। শিল্পসাহিত্যে রূপায়িত জীবন ভাষিক পরিপাট্যের আলোকে কালোত্তীর্ণ সত্তায় রূপায়িত হয়েছে। ছোটগল্পের আঙ্গিক সৌন্দর্য তথা প্লট, চরিত্রায়ণ, সংলাপ ও বাগভঙ্গির সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

> ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচনে তাঁর যেমন নিজস্বতা আছে, তেমনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি। ব্যক্তি এবং সমাজচেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তাঁর ভাষারীতির আঁধারে ধরে রাখেন।[৫২]

ছোটগল্পের ভাষা ও রচনারীতি বড় পরিসরে নয়, বরং ছোট পরিসরে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দ্যোতনা সঞ্চার করা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। এ দিক থেকে ছোটগল্পের ভাষার মধ্যে পরিমিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। ছোটগল্পের ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা।[৫৩]

এখানে বর্ণনার ছটা বা ঘটনার ঘনঘটা কোনোটিই থাকবে না। ছোটগল্পের ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> বিষয় অনুসারেই ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। বলিবার কথাটুকু পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে বলিবে–তজ্জন্য ইংরেজি, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, গ্রাম্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে।[৫৪]

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে দুজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যায়–

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস–

> সমাজের প্রবল ভাংচুর, সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের সংযোগ প্রভৃতির ফলে মানুষের গভীর ভেতরের যে রদবদলের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছোটগল্পের শরীরেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। 'ছোটপ্রাণ', 'ছোটকথা', বলে এখন কিছু আছে কি? 'ছোটদুঃখ' কোনটি? প্রতিটি ছোটদুঃখের ভেতর চোখ দিয়ে দেখা যায় তার মস্ত প্রেক্ষাপট, তার জটিল চেহারা এবং তার কুটিল উৎস। ছোটগল্পের হৃৎপিণ্ডে যে প্রবল ধাক্কা আসছে তা থেকে তার শরীর কি রেহাই পাবে?[৫৫]

অনীক মাহমুদ–

---

[৫২] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০, পৃ. ৪৩

[৫৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলি*, দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ষা-যাপন, সোনারতরী, ঢাকা, জয় বুকস, ১৪০৬, পৃ. ২৫

[৫৪] *বঙ্কিম রচনাবলি* (সম্পাদক : সুবোধ চক্রবর্তী), কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩৭৩

[৫৫] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

ছোটগল্পের শরীর বৃত্তে উপন্যাসের মতোই প্লট, চরিত্র, সংলাপ, সময় ও ঘটনাস্থল, পরিবেশ সর্বোপরি গল্পের সামগ্রিক সুর প্রোথিত থাকবে।[৫৬]

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে শিল্পরীতির পরিবর্তন ঘটেছে প্রায়শই। শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রেণিদ্বন্দ্ব থেকে ব্যক্তিক, উদার মানবিক চিন্তাধারা তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্থানিক ভাষা, গ্রাম্যজীবনের রূপায়ণ, নাগরিক জটিল মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে নানামাত্রিক পরিচর্যারীতির আশ্রয় নিয়েছেন লেখক। তিনি লিখেছেন :

আমার ছোটগল্পে আদিম গণমানবের অস্তিত্বের সংগ্রাম এসেছে; কিন্তু বেশিরভাগই উচ্চবিত্তের যৌন ভণ্ডামি, চরিত্রস্খলন ও আত্ম-প্রতারণার প্রতি বক্রোক্তি।[৫৭]

তিনি আরও বলেন–

যে লেখা যে তৃপ্তি নিয়ে আসে সেটাই তার ভাষা,–একই উৎস কিন্তু অপূর্বতাই তার মহিমা, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অথচ বস্তুনিষ্ঠ এই মন্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।[৫৮]

বাংলার গ্রামীণ জীবনের ও শহুরে নাগরিকদের চরিত্রায়ণে, কাব্যময় ভাষায় বর্ণনার শিল্পীমাধুর্যে ও বাক্যবিন্যাসের চমৎকারিত্বে তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

জনসাধারণের সংগ্রাম তাঁর উপজীব্য হলেও তিনি এই ঘটনাকে একান্ত করে দেখেননি, কুশীল শিল্পীর মতো তাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।[৫৯]

আলাউদ্দিন আল আজাদ ষাটের দশকে মানব মনস্তত্ত্ব-নির্ভর বেশকিছু শিল্পসার্থক ছোটগল্প রচনা করেছেন। মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে প্রয়াসী আজাদের এসব গল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্বে যে রূপ ধরা পড়েছে তা আলোচনা করা হলো।

'বৃষ্টি' (১৯৫৮) আলাউদ্দিন আল আজাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প। মানব মনের নিগূঢ় প্রান্তের উন্মোচনে প্রয়াসী লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে এ ছোটগল্পে। গ্রামীণ পরিবেশে দুর্বল নারী বাতাসির উপর অবিচার দিয়ে 'বৃষ্টি' গল্পের কাহিনি শুরু হয়েছে। মৌলানা মহিউদ্দিন মসজিদে বলেন, অনাবৃষ্টির কারণ নারীর

---

[৫৬] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, সূচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৯

[৫৭] আলাউদ্দিন আল আজাদ, সাহিত্য সাধনায় আমার পঁচিশ বছর : স্বাধীনতা উত্তর কাল; *শ্রেষ্ঠপ্রবন্ধ*; গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪১৫

[৫৮] *জীবনসাহিত্য*, সম্পাদনা : সিকদার আবুল বাশার, বাতায়ন প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ১৪৩

[৫৯] শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকা, কলকাতা, ১২ই জুন, ১৯৫০

বেপর্দা, অবৈধ-গর্ভবতী হওয়া। তারপর খোঁজ নিয়ে লোকেরা জানতে পারে বাতাসির স্বামী মারা গেছে সাত-আট মাস আগে অথচ তার পেটটা যেভাবে ফুলছে তাতে মনে হলো বাতাসি চার-পাঁচ মাসের গর্ভবতী। তাকে শাস্তি দিতে মরিয়া হাজী কলিমুল্লাহ। শুক্রবার রাত বারোটায় মৌলানা মহিউদ্দিনের বৈঠকখানায় বিচার শুরু হলো। তিন দিন তিন রাত হাদিস-কিতাব ঘেঁটে একটা ফতোয়া তৈরি করেছিলেন হাজী কলিমুল্লাহ। বিচার হলো বাতাসি ও ছমুর। পঞ্চাশ জুতোর বাড়ি ও গ্রামছাড়া করার বিচার করে ঘরে ফিরে এলো হাজী কলিমুল্লাহ। তারপর বৃষ্টি নামল।

'বৃষ্টি' গল্পে বাতাসির বিচারের আয়োজনের সমান্তরালে হাজী কলিমুল্লাহর তৃতীয় স্ত্রী জোহরার সঙ্গে সৎ ছেলে খালেদের প্রণয়াবেগ ও কামজ প্রেমের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন গল্পকার। খালেদের সঙ্গে সঙ্গে জোহরার প্রণয়ের সূচনামুহূর্ত বিনির্মাণে প্রকৃতি সংলগ্ন প্রতীকী পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন আজাদ।

> মরাগাঙে এখন হাঁটুপানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচিধানপাতার জড়াজড়ি।[৬০]

> জোছনায় আলোকিত বড় ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা ভুরুর নিচে ওর সুন্দর চোখজোড়া আরো সুন্দর মনে হলো তার, একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছলছলানিতে বনের অন্ধকারে শিহরিত নদীর মতো দুলে উঠল বুকের ভিতরটা।[৬১]

ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনার ব্যবহার লক্ষ করা যায় খালেদ ও জোহরার বাড়ি ফেরার সময়। এখানে গল্পকার ইঙ্গিতধর্মী রূপকে পারস্পরিক প্রেমাবেগের টানকে প্রকাশ করেছেন :

> নদী পেরিয়ে এসে চপ্ চপ্ পানি থেকে পা দুটা ঝাড়া দিয়ে দিয়ে নতুন জুতো-জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হলো তার বুকের ভিতরে কিছু নেই। বিবাগি হাওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে ঝিম্ ধরে অবশ হয়ে এল।[৬২]

'বৃষ্টি' গল্পে রূপকের আড়ালে জোহরা ও খালেদের প্রেমের বর্ণনা করেছেন লেখক :

> বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে নদীতে আলোছায়ার লুকোচুরি, এক সময়

---

[৬০] 'বৃষ্টি', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৭

[৬১] 'বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৭

[৬২] 'বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৮

বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি। ঘর বাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরুগুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।[৬৩]

'বৃষ্টি' গল্প সম্পর্কে সমালোচক আজহার ইসলাম লিখেছেন–

এই অসাধারণ গল্পটিতে আলাউদ্দিন আল আজাদ নর-নারীর যৌনতার বিষয়টিকে চমৎকার এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন।[৬৪]

যৌনতার আকর্ষণে নর-নারীর মনস্তত্ত্বে যে উত্থান-পতন ঘটে তার নিবৃত্তি ঘটে যৌনসঙ্গমে। অন্যদিকে মানবজীবনের এই মৌল চাহিদা যেন নব জীবনের ডাক দেয়। বৃষ্টি যেন নবজন্মের বার্তা বয়ে আনে। লেখক বর্ণনা করেছেন :

ধারাল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিক্ষোভ, ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে শুধু ঝর্‌ঝর ঝাপটা দিয়ে গেল।[৬৫]

চরিত্রায়ণ কৌশলে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন লেখক। হাজী কলিমুল্লাহ, মৌলানা মহিউদ্দিন গ্রামীণ ধর্ম-নির্ভর সমাজবাস্তবতার প্রতিভূ। ধর্মীয় ফতোয়াবাজি করে নিরপরাধী বাতাসিকে শাস্তি দিয়েছে অথচ নিয়তির নির্মম বাস্তবতায় হাদিস-কোরান ঘেঁটে ফতোয়া দেয়া হাজী কলিমুল্লাহর যুবতি বউ যৌন চাহিদা পূরণে সৎ ছেলের সঙ্গ পেয়েছে। গল্পকার এখানে ব্যঙ্গের মধ্যদিয়ে ধর্মান্ধদের কটাক্ষ করেছেন। ভাষা ও সংলাপের চরিত্রানুযায়ী ভাষার ব্যবহারে গল্পটি শিল্পসফল হয়ে উঠেছে। আরবি-ফার্সির শব্দের ব্যবহার করেছেন মৌলানা মহিউদ্দিন :

বেরাদরনে ইসলাম! আমি অধম বান্দা, আপনাদের খেদমতে কী বয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল।[৬৬]

'বৃষ্টি' গল্পে লেখক অলংকার, পরিচর্যারীতি, চরিত্রায়ণ, কাহিনি, ভাষা ও সংলাপ ব্যবহারে সুষম বিন্যাসের আলোকে শিল্প সার্থকতার সঙ্গে মানব মনস্তত্ত্বের প্রেম ও যৌনতার যে যোগসূত্র রয়েছে তা উন্মোচন করেছেন। এ গল্প প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন :

'বৃষ্টি' গল্পটি খুবই বিশেষত্বপূর্ণ। আলাউদ্দিন আল আজাদের শ্রেষ্ঠগল্পের তালিকায় এটির অবস্থার শীর্ষে। লেখকের চিন্তা, পরিকল্পনা ও সৃষ্টির যে সংহত রূপ, প্রতীকী ও সাংকেতিক ব্যঞ্জনা এবং তার প্রকাশের ভাষায় যে পরিমিতিবোধ লক্ষ করা যায় তা গল্পটিকে শিল্প সার্থক করে তুলেছে।[৬৭]

---

৬৩ 'বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১০১-১০২

৬৪ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃ. ২০৮

৬৫ 'বৃষ্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৬৬ 'বৃষ্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

'কবি' (১৯৫৯) গল্পে মহসিন নামে এক কবিতাচর্চাকারীর জীবন-সংগ্রাম ও প্রণয়াক্রান্ত জীবনের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহসিন আচার-আচরণে ও ভাবনায়-বিশ্বাসে পুরোদস্তর একজন কবি। কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য হলো সে একজন প্রেমিক। এই প্রেমকে নিয়েই তার কবিতা চর্চা করা। যাকে ঘিরে তার সারা দিনের ভাবনা আর কবিতা লেখা সে হলো দুলি। গ্রামীণ পটভূমিতে লজিং মাস্টাররূপে মহসিন তার ছাত্রী দুলির মধ্যে প্রণয় সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে দুলির কারণেই তাদের দুজনের প্রেম পরিপূর্ণতা পায়নি। কবি মহসিন তাকে একান্তভাবে পেতে চেয়েছিল, করতে চেয়েছিল জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু একজন কবির স্বভাবের পরিপন্থি হলো মিলন। বরং বিচ্ছেদেই তার পরিপূর্ণতা। কবিতায় আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়েই সে তার পবিত্র প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। নতুন জীবনের প্রত্যয় নিয়ে এভাবেই মহসিনের ঢাকায় আগমন। মহসিন কবিতা প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের কাছে যায় কিন্তু কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। প্রকাশক একজন নিরস ব্যবসায়ী। সে নির্বিচারে মন্তব্য করল, কবিতা? কবিতার যুগ তো অনেক আগেই চলে গেছে। শুরু হলো কঠিন সংগ্রামশীল জীবন। এই জীবনই তাকে কাব্যচর্চার আবেগময় পথ থেকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবতার পথে। খবরের কাগজে মানিক নামক হকারের সান্নিধ্যে সে জানতে পারল হৃদয়টা কবিতা হলেও জীবনটা কবিতা নয়। মানিকের সঙ্গে সে বস্তিতে বসবাস করতে শুরু করে। মানিকের বোন জয়তুনের সেবায় মহসিন উপলব্ধি করে জীবনটাও কখনো কখনো কবিতা হয়ে উঠতে পারে। জানা গেল জয়তুন বিবাহিতা, তার স্বামী বাদশাহী মসজিদের মুয়াজ্জিন। সে কবিকে জানিয়ে দিল মুয়াজ্জিনের সঙ্গে ঘর করবে না। এবার মহসিন যেন তার হৃদয়বৃত্তির অনুকূলে আরেক আলোর সন্ধান পায়। গল্পকার এ গল্পে মহসিনকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে স্থান দিয়ে কবিতাচর্চাকারীর জীবনদর্শন ও সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পকার এ গল্পে সমকামিতার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন প্রতীকী বাক্যের মধ্য দিয়ে। মুয়াজ্জিনের সমকামিতার কারণে যৌনসুখ-বঞ্চিত জয়তুন মহসিনের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে যৌনসুখে নিজেকে আবদ্ধ করেছে সমাজ-বিরুদ্ধ পন্থায়। প্রেম ও যৌনসঙ্গমের মধ্য দিয়ে ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনার চূড়ান্ত রূপায়ণ ঘটেছে এ গল্পে। গল্পকার এখানে বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে সদর্থকতায় উপনীত হয়েছেন এবং সমকামিতাকে নঞর্থকভাবে দেখে মানুষের জৈবিক চাহিদার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

এ গল্পের ভাষা ও সংলাপ নির্মাণে লেখক স্থানিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। সেই সঙ্গে বিদেশি ভাষার ব্যবহারও চরিত্রের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। দুলির সঙ্গে মহসিনের সংলাপ :

---

[৬৭] 'বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, ভূমিকাংশ, পৃ. ৯৮

মা ডাকছে মাস্টার সাব! ও বলল, আমি এখন আসি![৬৮]

এ গল্পে উর্দু ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয় :

নাম-ঠিকানা লেখা শেষ হলে ম্যানেজার ছোকরাটাকে ডেকে বলল, মনা! সাহাবকো তিন নম্বর কামরে মে ভেজ দো। বহুৎ আচ্ছা। মনা উর্দু বলে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।[৬৯]

স্থানিক ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায় বই ছাপাতে গিয়ে মহসিনের সঙ্গে লাইব্রেরিয়ানের কথোপকথনে :

কবিতা? কবিতার যুগ তো অনেক আগেই চলে গেছে সায়েব। কলকাত্তাই টানে ঘাড় মোটা ভাঁটি চোখ বেঁটে খাটো লাইব্রেরিয়ান বললেন, ছ্যালেন বটে রবিঠাকুর। কিন্তু ওঁর কবিতাও আজকাল চলে না।[৭০]

ভাষা, সংলাপ, রঙ্গব্যঙ্গ ও মানব জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব প্রতীকী পরিচর্যায় এ গল্প রূপায়িত করেছেন গল্পকার।

এ গল্পে কবি হওয়ার প্রত্যয়ে সংগ্রামরত মহসিনের গ্রাম্যজীবনের প্রেমে ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে চেতনা প্রবাহরীতির ব্যবহার লক্ষণীয় :

ভাবল কেন সে মরবে? আত্মহত্যা তো কাপুরুষের কাজ। সে কবি, ব্যথার দহনে খাঁটি সোনা হয়ে ওঠাই তার ভাগ্যলিপি। সে সমগ্র মানবাত্মার প্রতিনিধি, সরল গরল পান করে নীলকণ্ঠ হওয়াই যে তার সাধনা। [পৃ. ১০৭]

উপমার ব্যবহার লক্ষণীয়–

১. সকলেই কান পেতে থাকে, চেয়ে থাকে সাগ্রহে বৃত্তের মধ্যে বিন্দুর মতো। [পৃ. ১০৭]

২. এ যে রক্তের অক্ষরে লেখা। [পৃ. ১০৭]

লেখক 'কবি' গল্পে সংগ্রামরত মহসিনের মধ্য দিয়ে এ ভূখণ্ডের লেখক-সাহিত্যিকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দিনগুলোরই যেন রূপায়ণ করেছেন।

'এক জোড়া নীলচোখ' (১৯৫৯) গল্পের কাহিনি নাগরিক পটভূমিতে লেখা। আর এ গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে আর্ট স্কুলের ছাত্র শাহতাব ও তার বন্ধু জাহাঙ্গীরের বোন জিনাত মহলকে কেন্দ্র করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়ির কাজের ঝি আন্নি ঘটনাংশের মধ্যে প্রবেশ করে এ গল্পে মানব মনস্তত্ত্বের জটিল অন্তর্বাস্তবতাকে শিল্পসার্থক করে তুলেছে। এবং গল্পটি ফ্রয়েডীয় ভাবনায় সমর্পিত হয়েছে। সতেরো বছর বয়সি জিনাত মহলকে শাহতাব আঠারো বছর বয়সি ঝি-কন্যা আন্নির মাধ্যমে একের পর এক পত্র

---

৬৮ 'কবি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৬৯ 'কবি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৭০ 'কবি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

প্রেরণের সাহায্যে তার আবেগের সহযোগী করার প্রয়াস পায়। এভাবে সে এক সময় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু এক সময় প্রচণ্ড আবেগে শাহতাব সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে বাড়ির কাজের ঝি আন্নির সঙ্গে। শাহতাব জিনাত মহলকে যে চিঠিগুলো পৌঁছে দিতে বলেছিল আন্নিকে, আন্নি তা নিজের কাছে রেখে দিয়ে যৌনাকর্ষণে শামিল হয়েছে। শাহতাবের প্রশ্ন আন্নিকে :

> আমার চিঠিগুলো তুমি মহলকে দাওনি। তুমি আন্নি? না।
>
> আমার শিথিল হাতের পাতাটা নিজের হাতে বোলাতে বোলাতে ও বলল, আমিই সেগুলি রেখেছি এবং জবাব দিয়েছি। সেগুলি কি আমার হতে পারতো না?[৭১]

শাহতাবের প্রেমপূর্ণ উপলব্ধিতে জিনাত মহলের যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তারই বিপ্রতীপে বাড়ির ঝি আন্নি, জিনাত সেজে এসে প্রতারণাপূর্ণ সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। গল্পকারের বর্ণনা :

> উদ্ভিন্নযৌবনা নারীস্তন আমার প্রবল আলিঙ্গনে পিষ্ট হতে থাকে। সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ। মাটিতে লেপটে বসে তাকে শুইয়ে দিলাম। ওর এলোচুল ভরা মুখটা বাঁ হাতের ওপরে আকর্ষণ করি। হাত দিয়ে বাধা দেয় সে। কিন্তু এখন কি বাধা মানবার সময়? ওর হাত ছাড়িয়ে মুখটা সবেগে এগিয়ে নিলাম। কিন্তু একি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঠোঁট জোড়া তুলে এনে উচ্চারণ করলাম, আন্নি!
>
> আমার বক্ষ স্পন্দন যেন হঠাৎ থেমে গেল, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল।[৭২]

পরবর্তী সময়ে আবার শাহতাবের প্রশ্ন–

> আন্নি! এ তুমি কী করলে আন্নি। সব কিছু নষ্ট করে দিলে।[৭৩]

জটিল মনোজাগতিক সংকটে আপতিত হয়ে শাহতাব বলেছে–

> এ প্রশ্নের উত্তর কি হবে আমি জানি না। মনে মনে কেবল ঠিক করলাম, কাল সকালের ট্রেনেই বাড়ি চলে যাব।[৭৪]

'এক জোড়া নীলচোখ' গল্পে শাহতাবের প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটে বিদারক ঘটনা। শাহতাব তার হৃদয়ের মণিকোঠায় যাকে স্থান দিয়েছে সেই জিনাত মহলের নীলচোখের স্পর্শ তো পাইনি বরং আন্নি জিনাতের চিঠিগুলো রেখে দিয়ে প্রবঞ্চনা করেছে। এ গল্পে বাড়ির গৃহস্থালিকর্মে নিযুক্তদের প্রেম-ভালোবাসা, যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন আজাদ। লেখক এখানে মানবমনে জন্ম নেয়া প্রেমবিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের বিজয় ঘোষণা করেছেন।

---

৭১ 'এক জোড়া নীলচোখ', পৃ. ১২১

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

ধর্ম-বর্ণ, স্থান, বয়সের সবকিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করে একটি মনের সঙ্গে আরেকটি মনের মিলিত হওয়ার যে অমোঘ বাসনা সেটি চিত্রিত হয়েছে এ গল্পে। গল্পকার এ গল্পের মাধ্যমে কল্পিত প্রেমের বিপরীতে যৌনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

'এক জোড়া নীলচোখ' গল্পে উপমা ব্যবহার করেছেন গল্পকার :

> তুমি এখন, ভেনাসের মর্মর মূর্তির মতো।[৭৫]

এছাড়াও গল্পকার এখানে 'কামনার সাত রং', 'দেহকে করবো বীণা', এসব অলংকারের ব্যবহার করেছেন প্রেম ও মনস্তত্ত্বের তীব্রতা বোঝাতে। কাহিনি, চরিত্রায়ণ, পরিচর্যারীতি, নাটকীয়তা ও প্রতীকী পরিচর্যার ব্যবহারে 'এক জোড়া নীলচোখ' গল্পটি প্রেম ও মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিল্পসার্থক ছোটগল্প হিসেবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

'উজান তরঙ্গে' (১৯৫৯) গল্পটির পটভূমি গ্রামকেন্দ্রিক। এ গল্পের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে নিতাই বর্মণের মেয়ে যমুনা ও নৌকার মাঝি জুলমতের জীবন যাপনের সূত্র ধরে। সাতচল্লিশের দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তরজনিত রুগ্‌ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যমুনা স্বামীগৃহে ধর্ষিত হবার পর বেঁচে থাকার তাগিদে দেহপসারিণী পেশায় প্রবৃত্ত হয়। মুসলমান জেলে জুলমতের সঙ্গে হিন্দু যমুনার পারস্পরিক প্রেমাবেগ, কামজ প্রেম থেকে দেহাতীত শুদ্ধপ্রেমে উত্তরণ দেখিয়েছেন গল্পকার। এ গল্পে একজন নারীর প্রতি একজন পুরুষের দুর্দম ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। যমুনা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেও হাল ছেড়ে না দিয়ে জুলমত শেষ পর্যন্ত যমুনার ভালোবাসা পেয়েছে। 'উজান তরঙ্গে' গল্পে যমুনার প্রতি জুলমত মাঝির প্রেম, সহানুভূতি এবং জুলমতের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। পিতা নিতাই বর্মণের অন্তিমকালে যমুনা জুলমতের নৌকায় চড়ে বাপকে শেষবারের মতো দেখতে আসে। পিতার মৃতদেহ সৎকার করে যমুনা জুলমতের নৌকায় ফিরে আসে। জুলমতের নৌকায় যমুনা একা অথচ তার প্রতি জুলমতের এবং জুলমতের প্রতিও যমুনার কামপ্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়নি শুদ্ধসত্তার প্রেম জাগরণের ফলে। এ গল্পের কাহিনি প্রসঙ্গে আজহার ইসলাম লিখেছেন :

> প্লেটোনিক প্রেমের অনুরণন জাগানো এই গল্পটি লেখকের কাঁচা রোমান্টিকতার ফসল। তিনি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন প্রেমের কাছে কাম চিরকালই পরাভূত। লেখকের এই অনুভবে যমুনা কর্তৃক বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও জুলমত অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তার প্রেমকে লালন করেছে।[৭৬]

---

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[৭৬] আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

উজান তরঙ্গে ফ্লাশব্যাকের সাহায্যে গল্পকার অতীতের স্মৃতিচারণ করেছেন। যমুনার বাবা নিতাই বর্মণের স্মৃতিভাষ্যে পঞ্চাশের দাঙ্গার ফলে জেলেপাড়া উজাড় হওয়ার বর্ণনা আছে এ গল্পে। এরপর যমুনাকে বলাৎকার করার পর যমুনার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাবার পরে যমুনা দেহপসারিণী পেশায় নিয়োজিত হয়। নিতাই বর্মণ মারা যাবার পর তার মেয়ে যমুনার মনোজগৎকে প্রকৃতির রূপকে, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় বর্ণনা করেছেন গল্পকার :

> আকাশে এখনো কালো কালো মেঘভার। ফাঁকে-ফোকরে দু'একটি তারা দেখা গেলেও সেগুলো নিষ্প্রভ। কার মন্ত্রবলে যেন গাছপালা বন উপবন নদীর বুক স্তব্ধ হয়ে আছে। চতুর্দিকে এক ভৌতিক নীরবতা।[৭৭]

যমুনার বাবার দাহকার্য সম্পন্ন করে ফিরে যাবার সময় যমুনা যখন জুলমতের গায়ের ওপর ঢলে পড়ল তখন জুলমতের চারিত্রিক সংযমের ব্যাখ্যা করেছেন আজাদ। অত্যন্ত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও শারীরিক উত্তেজনা প্রশমনের বিষয়টি আজাদের বর্ণনায় উঠে এসেছে।

> কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য তার পাশব উত্তেজনা কোথায় মিলিয়ে গেল। একটু কাছে এলেই যারা সর্পের মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠত, তারা এখন পলাতক। যে শুয়ে আছে পরম নির্ভয়ে, তার দেহটাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই প্রবৃত্তি?[৭৮]

জুলমতের মানবিকতাপূর্ণ উপলব্ধির শিল্পভাষ্য রূপায়িত হয়েছে এ গল্পে। যমুনার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে মানবিক সত্তায় উপনীত হয়েছে জুলমত। গল্পে উঠে এসেছে :

> সারা শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সে বিশ্বাস করে, ফতুর সঙ্গে যমুনার কোনো প্রভেদ নেই। দুই অবস্থায় সে একইজন। সেজন্য যদি তারা হয়ে জেগে থাকে আকাশে তাহলে মেঘের ফাঁক দিয়ে পৃথিবীর নৌকার ওপর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখছে সে নিজেকেই। জুলমত নিচু হয়ে যমুনার কপালে একটা চুমু খেল।[৭৯]

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'উজান তরঙ্গ' গল্পটি সাতচল্লিশের দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তরজনিত রুগ্‌ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত দারিদ্র্যপীড়িত যমুনা ও জুলমতের কামজ প্রেম থেকে দেহাতীত শুদ্ধপ্রেমে উত্তরণের আখ্যান। প্রেমের প্রভাবে কামজসত্তার পরাজয় ঘোষিত হয়েছে এ গল্পে। যমুনা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত জুলমত শেষ অবধি যমুনার সম্মতি পেয়ে নতুন ঘর বাঁধার প্রত্যয়ে অগ্রসর হয়েছে সম্ভাবনার পথে। যেন জুলমতের মনে উজানের ঢেউ উঠেছে। ভালোবাসায় উদ্দীপিত জুলমত প্রয়োজনে উজান তরঙ্গ ঠেলে পাড়ি দিতে প্রস্তুত বিপৎসংকুল পথ।

---

[৭৭] *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১২৬

[৭৮] *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১২৭

[৭৯] *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১২৮

'উজান তরঙ্গে' ছোটগল্পে জুলমত ও যমুনা চরিত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুবের ও কপিলার ছায়াপাত লক্ষণীয়। উভয়ে বিবাহিত হলেও নতুন ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লেখক এই গল্পে নাট্যিক সংবেদনা অব্যাহত রেখে এক পরিশীলিত ও পরিমার্জিত আচরণ সহযোগে জুলমত-যমুনার প্রণয়াবেগকে চিত্রিত করেছেন। এ গল্পে স্থানিক ভাষার ব্যবহার, চরিত্র চিত্রায়ণে দক্ষতা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও যৌনতার বর্ণনায় সুষম বিন্যাস গল্পটিকে শিল্পসফল করে তুলেছে।

'পাশবিক' (১৯৬০) গল্পে কুতুবের মধ্যে প্রেমের জন্ম এবং জয়নাবের প্রতি ভালোবাসা তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। প্রেম ও মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাসে খুনি কুতুব শুদ্ধতার পথে হেঁটে ভালো মানুষ হতে চেয়েছে। এক নতুন প্রেমাবেগ তাকে শুদ্ধতার পথে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কুতুব ও জয়নাব চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে লেখক মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন।

'পাশবিক' গল্পটি ডাকাতদলের সর্দার কুতুবের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে তার সুখী দাম্পত্যের মাঝে হঠাৎ বউ পালিয়ে যাবার প্রেক্ষাপটে ডাকাতির পাশাপাশি নারীর প্রতি তীব্র অবজ্ঞা, ঘৃণার বীজমন্ত্র রোপিত হয়েছে তার মনোভূমিতে। গল্পকার লিখেছেন :

> ঘুমন্ত স্বামীর বুকের কাছ থেকে তার বৌকে তুলে এনে মউজ করার মতো বাহাদুরি আর কী আছে? এও ঠিক অতর্কিতে বুকে ছুরি বসিয়ে খুন করারই শামিল, হাত পা ছোঁড়া চিৎকার, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটার মত! আর মেয়ে-জাতটাকে নিয়ে তো এই করা উচিত। ওর বৌ মায়মুনা যেদিন একটা মজুর পোলার সঙ্গে পালিয়ে চিরতরে উধাও হয়ে গেল, সেদিন থেকেই তার এই অনুভূতি।[৮০]

নারী কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার কুতুব এরপর এগারোটি খুন করেছে। ডাকাতদের দেখে ভেংচি কাটার কারণে জয়নাবকে ধরে নিয়ে আসে কুতুবের লোকেরা। পরে অন্যরা তাকে ভোগ করতে চাইলেও কুতুব ডাকাত বাধা দিয়েছে। তারপর নিজের দলের সদস্যদের সঙ্গে এ নিয়ে লড়াইয়ের শেষে কুতুব গ্রেফতার হয়। জয়নাব আদালতে তার বিষয় অস্বীকার করে। কুতুবের সঙ্গে জয়নাবের কামজ প্রেমের কারণে জয়নাব আদালতে কুতুবের শাস্তি চায়নি :

> না না হুজুর, এরে তো আমি দেহি নাই! অন্য লোক আছিল।[৮১]

'পাশবিক' গল্পে আজাদ স্থানিক ভাষা ব্যবহারে সচেষ্ট :

> মাইরা ফালাইলে আমরা করম কী? গোশত ছিঁইড়া খাম, কি যে কস্‌রে? হেঃ হেঃ ওরে আমার সম্বন্ধীরা! জলপুলিশ বাবারা আইলে নিস্তার নাই।[৮২]

---

[৮০] 'পাশবিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

[৮১] 'পাশবিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

ডাকাত সর্দারের বর্ণনায় উপমার ব্যবহার লক্ষণীয়।

> যেন এক পুঞ্জীভূত আদিম শক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি।[৮৩]

ডাকাত সর্দার কুতুবের আত্মসমর্পণ এবং বিচার প্রক্রিয়ায় জয়নাব কর্তৃক কুতুবের দোষ অস্বীকার প্রেম ও মনস্তত্ত্বের অন্য দিক উন্মোচন করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> এ গল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের আরেক উন্মোচন আমরা লক্ষ্য করি জয়নাবের মধ্যে। দস্যুসর্দার কুতুবের বিচারানুষ্ঠানে আদালতের বিচারক যখন জয়নাবের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে তখন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে জয়নাব অস্বীকার করলো কুতুবের দোষ। আইনজীবী ও বিচারকসহ সকলে বিস্মিত হলো তার এমন সাক্ষ্যে।[৮৪]

পরে অবশ্য কুতুব নিজেই দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে শুদ্ধতার পথে চলার মত ব্যক্ত করে।

> চলন্ত জেলের গাড়ির ভিতরে হাতকড়া নিয়ে বেঞ্চিতে বসে সে ভাবলো, সাতটা বৎসর কিছু নয়, দেখতে দেখতে চলে যাবে! ভালোমত চললে কিছু মাপও পেতে পারে। এরপর একদিন জেলখানার উঁচু দেয়ালের ভিতর থেকে বেরুবে নিশ্চয়ই। বেরিয়ে এসে মজুর খাটবে, তবু বিপথে চলবে না। আস্তে আস্তে রোজগার করে পয়সা জমিয়ে বাপের ভিটেতে একটা ছোট ঘর তৈরি করবে সে। তারপর? তারপর করবে একটা বিয়ে এবং তখন জয়নাবকে যদি না পায়, দেখে শুনে এমন একটা মেয়ে খুঁজে নেবে যে হবে ঠিক তারই মতো।[৮৫]

'পাশবিক' গল্পে প্রেমের সুমহান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। মানব মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাসের আলোকে এই গল্পে গল্পকার নর-নারীর অন্তর্বাস্তবতা যেমন তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি স্থানিক ভাষা, অলংকার ব্যবহার ও চরিত্রায়ণ কৌশলে মানব মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

'পরী' (১৯৬০) গল্পে পরী নামের যুবতির ওপর ধনু মোল্লার রিরংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করার বাসনার কাহিনি বর্ণনা করেছেন গল্পকার। পরীর স্বামী রহিম একটা অলস, অপদার্থ, স্ত্রীর রোজগারের উপর যে সারাবছর নির্ভর করে। পরজীবিকা নির্বাহের তাগিদে ধনু মোল্লার বাড়িতে কাজ করে সে। পরীর প্রতি মোল্লার অসম আকর্ষণ তার পুত্রবধূদের হাসির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাত-বিরাতে ধনু মোল্লা পরীকে যত কাছে টানে, পরী কোনো-না-কোনো অজুহাতে তত সরে পড়ে। মানুষের লোভ দুর্দমনীয়। ধনু মোল্লা পরীকে সোনার হার দিয়ে বশ করে। রাতে সে পরীকে একান্তভাবে কাছে পেলেও তার পক্ষে সুখ-প্রয়াসী পরীকে স্বস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। পরী ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ধনু মোল্লাকে ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। ধনু মোল্লার সঙ্গে পরীর যৌনতার প্রসঙ্গ ইঙ্গিতময় সুষম বাক্যবিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার :

---

৮২ 'পাশবিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৮৩ 'পাশবিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৮৪ *নির্বাচিত গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৮৫ *নির্বাচিত গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

কিন্তু সব বৃথা। চরম বিরক্তির সঙ্গে ঝামটা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে ও ঠিকঠাক হতে থাকে। নিঝ্‌ঝুম রাত্রি; কিন্তু অকস্মাৎ চারদিকটা যেন অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে গেল। দুই হাতে মুখ ঢেকে মাটি লেপটে বসে পড়ে ধনু মোল্লা। বিফল, বিফল সব উদ্যম, সব আয়োজন বিফল।[৮৬]

এ প্রসঙ্গে আজহার ইসলাম লিখেছেন :

আলাউদ্দিন আল আজাদ এই গল্পে মানুষের জীবনের উপর নিয়তির যে একটি নিষ্ঠুর বিধান আছে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন, অনিবার্য বলেই মানুষের পক্ষে তাকে মেনে না নিয়ে গত্যন্তর নেই।[৮৭]

বৃদ্ধের এই যৌন-অসামর্থ্যের চিত্রে পরাজিত মানবাত্মার ক্রন্দনের যে সুর বেজে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সেই বিষাদের সুর পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। আলাউদ্দিন আল আজাদ এই গল্পে গ্রামীণ লোকজ অনুষঙ্গ, লোকজ কুসংস্কার এবং স্থানীয় ভাষার ব্যবহার করেছেন।

ক. গ্রামীণ বর্ণনা

একেবারে পিছনে ঘনঘোর বরাক ঝাড়ের কাছাকাছি ছনের তৈরি মোল্লাবাড়ির রান্নাঘর। একটু বাতাস বইলে চালের ওপর যে সর্‌সর আওয়াজ হয়, তা যেন বাঁশ পাতার নয়, ভূত প্রেতের ফিসফিসানি, কানাকানি।[৮৮]

খ. গ্রামীণ কুসংস্কার :

"কুঃ! কুঃ! ঘরের চালের কাছে বাঁশঝাড়ে প্যাঁচা ডাকছে পরী এতক্ষণ শুনতে পায়নি, হঠাৎ খেয়াল করলে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। প্যাঁচার এই একটানা বীভৎস ডাক নাকি মৃত্যুর সংকেত।"[৮৯]

গ. স্থানীয় ভাষা :

রইম্যারে খতম কইরা আইছি, দুনিয়া উইল্‌ডা যাউগ্‌গা আমি তরে শাদি করুম পরী।[৯০]

এসব উপকরণে গল্পকার গল্পকে নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ করে তোলার এই প্রয়াসে গল্পটি সফলতা পেয়েছে।

'জীবন জমিন' (১৯৮৮) গল্পটি বঙ্গোপসাগরের চরাঞ্চলের নিয়তিলাঞ্ছিত হানিফের জীবনের কাহিনি নিয়ে রচিত। এই গল্পে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হানিফ শেখের জীবনের নানা মাত্রিকতা বর্ণিত হয়েছে। স্ত্রী-বিয়োগের পরে পুত্র রুস্তমকে বড় করার জন্য বিয়ে করেছে পুনর্বার কিন্তু সে পালিয়ে গেছে। শেষ পর্যায়ে হানিফ শেখ পুত্রবধূর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়ে আত্মোপলব্ধিতে সমর্পিত হয়েছে। এ গল্পে মানব

---

৮৬ 'পরী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৮৭ আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

৮৮ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫১

৮৯ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫১

৯০ 'পরী', *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৫৫

মনস্তত্ত্বের বর্ণনা এসেছে–ভাষা, সংলাপ তথা শিল্প প্রকরণের বিচিত্র অনুষঙ্গে। 'জীবন জমিন' গল্পে যৌনতার বর্ণনা করেছেন। লেখক ভাষিক পরিপাট্যে হানিফের সঙ্গে পুত্রবধূর রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন :

> এইতো দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। বহুদিনের ক্ষুধার্ত অসহিষ্ণু হানিফ এক লাফে কাছে গিয়ে দু'হাত জাপটে ধরে। হ্যাঁ হ্যাঁ কি কুদরত। পরী নয় পেত্নী নয়–একটা জ্বলজ্যান্ত মাংসল মেয়ে মানুষ। মাথাভরা চুল, পুরু নরম ঠোঁটজোড়া। কিছুক্ষণ বুকে প্রবলভাবে চেপে রাখার পর পাগলের মতো সব কাপড় খুলে ফেলতে থাকে।[৯১]

আলোচ্য গল্পে প্রহেলিকার সৃষ্টি করে গল্পকার শ্বশুর-পুত্রবধূর যৌনক্রিয়াকে কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করলেও মানুষের আদিম কামতৃষ্ণার সর্বগ্রাসী রূপ উন্মোচন করেছেন। অরুন্ধতি রায় তাঁর *গড অব স্মল থিংস* উপন্যাসে যমজ ভাইবোনের যৌনক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন যা সমাজস্বীকৃত নয়। সাহিত্য সম্ভাবনাময় বিশ্বের কথা বলে। যা হয়নি অথচ হতে পারত এমন বিষয়ের অবতারণা কেবল শিল্প-সাহিত্যেই সম্ভব। এই গল্পে সে প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই গল্পটি আলাউদ্দিন আল আজাদের এক দুঃসাহসিক সৃষ্টি।

'জীবন জমিন' গল্পে চরের মানুষ হানিফ শেখের মুখের ভাষা স্থানিক ভাষারই প্রতিচ্ছবি। হানিফ শেখ বলেছেন–

> হা হা সমুন্দিরা মোচে খুব তাও দিতেছে। কিন্তুক ঘি খাইবার পারবা না। হানিফ্যা বাঁচিয়া থাকিতে না। ওই সরহার মিঞা লাডিয়াল পাডাইছিলো না? আবার খায়েস ক্যা? বাহাদুর কুতুব্যা, কই গেলো–লেঙুর উঁচাইয়া পলাইছিল না? আরে তুমি নেতা হইতে চাও ভালা কথা–কিন্তুক জিহ্বাডা অমন দশ হাত লম্বা ক্যা? আমরার জমিন ভাইঙা চর পড়ছে, এতো আমাগো জমিন-সম্পত্তি। তুমি দলিল কইরা নিওনের ক্যাডা? তুমি ক্যানে বন্দোবস্ত নিবা, হ্যাহ্।[৯২]

'জীবন জমিন' গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে জনমানুষের বাস্তবানুগ চিত্র উপস্থাপন ও মনোবিকলন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে যৌনতার সর্বগ্রাসী রূপকে চিহ্নিত করার সাহস দেখিয়েছেন আজাদ।

'যখন সৈকত' (১৯৬৩) গল্পে চেতনাপ্রবাহরীতির আলোকে আলাউদ্দিন আল আজাদ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন কলিম ও মর্জিনা চরিত্রদ্বয়ের, যারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। মর্জিনার স্বামী কলিমের অসুস্থতার কারণে সাংসারিক ব্যয় মেটানোর লক্ষ্যে মর্জিনাকে চাকরিতে যেতে হয়েছে; সেখানে তার অন্য আরেকটি পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আলবেয়ার কামু রচিত (১৯১৩-১৯৬০) 'আউটসাইডার' গল্পের মোরসল্ট ও মারিয়ার প্রণয়ের কথা স্মরণ করা যায়।

---

[৯১] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৫০

[৯২] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৫০

অপরদিকে স্বামীভক্ত স্ত্রী মর্জিনা তার সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে কলিমকে ভালো করে তুলেছে। মর্জিনার জীবনে ঘটে যাওয়া অতীতের বিপ্রতীপে স্বামী কলিমের মানসলোকে মর্জিনার প্রতি প্রেমপূর্ণ অনুভূতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের পঙ্কিলতার ভেতরে প্রেমের বীজ বপনে সচেষ্ট আজাদ :

> না মর্জি। তোমাকে ছাড়বো না।[৯৩]

কলিমের এই দৃঢ়চেতা মানসিকতার উৎসভূমি যেন মর্জিনার দেহত্যাগের মাধ্যমে স্বামীকে সুস্থ করে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ের সমার্থক। মর্জিনার বক্তব্য :

> বেহুলা যদি যমের হাত থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে আনতে পারে, এ যুগের আমি নারী কি একটু ওষুধও তোমার মুখে তুলে দিতে পারবো না?[৯৪]

'যখন সৈকত' গল্পে নারীলিপ্সু সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি প্রেমের জয়গান ঘোষিত হয়েছে।

'ধোঁয়া' গল্পটির কাহিনি গড়ে উঠেছে আবিদ ও তার স্ত্রী রাহেলার প্রেম-ভালোবাসার গল্পকে ঘিরে। আবিদ পাহাড়ি এলাকার চা বাগানের কর্মকর্তা। শহর থেকে দূরে নির্জন পাহাড়ি এলাকায় তাদের বসবাস। রাহেলা-আবিদের দাম্পত্যের মাঝে হঠাৎ আগমন ঘটে বাড়ির কাজের মেয়ে কালীর। আবিদের স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কালীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমের পরিণতিতে কালীর সন্তানের মর্যাদার দাবি নিয়ে আবিদের বাড়িতে আগমন এবং শেষ পর্যন্ত আবিদের স্ত্রীর কাছে গোপন যৌনতার প্রসঙ্গ উন্মোচিত হলে আবিদ নিবিষ্ট হন নেশায়। ধোঁয়া নামটি যেন প্রতীকী। আবিদকে মনোবাস্তবতার জটিলতায় নিক্ষেপ করেছে কালীর সন্তানের পরিচয়ের দাবি এবং তার শ্রেণিহীন কথাবার্তা :

> ১. কালী পিছন থেকে সামনে এসে জোরে জোরে বলে, তুই যে বলেছিলি; মুকে লিবি না সায়েব?
>
> মুকে কেনে মারবি সায়েব?
>
> ২. মোর পেটে তোর লেড়কা আছে, সে কুলি হইব। তাকে মারিস![৯৫]

এ গল্পের শিল্প প্রকরণে গল্পকার মার্কসীয় শ্রেণিহীনতার আশ্রয়ে উদ্বুদ্ধ। আবিদ শেষপর্যন্ত মদ্যপানে নিজেকে সমর্পিত করেছে দুঃখ ভুলতে, কিন্তু আবিদ শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কুলি-মজুরদের প্রতিবাদে

---

[৯৩] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২২১

[৯৪] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২০৭

[৯৫] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১৭৮

টিকতে না পেরে মাদকাসক্ত হয়েছে। আবিদ যেন প্রতিবাদের ধোঁয়া দেখেছে চারদিকে। শ্রেণিবৈষম্যের রূপও এ গল্পে পড়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের শ্রেণিচেতনা সম্পর্কে বশীর আল্‌হেলালের মন্তব্য।

> আলাউদ্দিন আল আজাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণমুখী প্রলেতারীয় কথাসাহিত্যের জীবন্ত ধারাটিকে পূর্ব বাংলায় সচেতনভাবে প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্বের কথা চিরকাল আমাদের স্মরণ করতে হবে।[৯৬]

'ধোঁয়া' গল্পে ভাষা ও সংলাপে স্থানিক বৈচিত্র্যের ব্যবহার প্রশংসাবাহী। কালীর উচ্চারণে পাহাড়ি ভাষা এবং আবিদের উচ্চারণে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ঘটেছে।

> ১. তুই সব জানিস সায়েব আমি পাগলী নই। তুই মুকে প্যার করেছিলি মনে নেই সায়েব? [পৃ. ১৭৭]
>
> ২. এসকো বাহার নেকাল দো। [পৃ. ১৭৭]
>
> ৩. হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? হোয়াট?[৯৭] [পৃ. ১৭৭]

আলাউদ্দিন আল আজাদ সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে এ গল্পে আবিদের মতো ধনীর কাছে গরিবের প্রেমের আবেদন যে তুচ্ছতম তারই যেন চিত্রায়ণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। রাহেলার স্বামীভক্তি শেষ পর্যন্ত তাকে নেশার জগতে নিয়ে গেছে। আবিদকে প্রাণমন সঁপে দেওয়া কালী পতিত হয়েছে যন্ত্রণার তীব্রতায়। এ গল্পের নাম প্রতিবাদী চেতনা 'ধোয়া' সার্থকতার পরিচয়বাহী।

'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫৩) গল্পের শুরু বেকার যুবক দুলালের চাকরির তদবিরের বর্ণনা দিয়ে শুরু হলেও এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রকৃতপক্ষে দুলালের বোন লীনা। লীনা প্রতারিত হয়েছে সামাজিক নানা শৃঙ্খলের কাছে। ডা. করিমের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত লীনার স্মৃতিভাষ্যে প্রেমের বর্ণনা উপমা সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক :

> কি সুন্দর আশ্চর্য উধাও হওয়া রাত আজ। চারিদিকে শুধু কানাকানি, শুধু বিহ্বলতা। রাতের আকাশের নিচে বহু বিস্তৃত নীল নীল সমুদ্রের ঢেউ তীরে গিয় আছড়ে পড়ার মতো এক দুর্বার ফেনিল উচ্ছলতা। এমন রাতে খুলে যায় আদিম চেতনার সিংহদ্বার। কামনার দল মেলে পদ্মের মতো। এমনি অনেক রাতে সে পেয়েছে প্রেম, দুর্লভ প্রেম, সোনার হরিণ।[৯৮]

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত প্রেমের বর্ণনা–

> এতো বড়ো পৃথিবীটাও একটা ছোট তুলতুলে শিশু আর তার মাকে জায়গা করে দিতে একেবারেই অক্ষম।[৯৯]

---

[৯৬] বশীর আল্‌হেলাল, *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৬৩-১৯৭৬), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

[৯৭] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১৭৮

[৯৮] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২০৬

[৯৯] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১০৭

লীনার প্রশ্নের জবাবে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি যখন সে ডা. করিমকে বলেছে :

> কেন কেন? তাহলে কেন আমাকে নষ্ট করলে তুমি, কেন?[১০০]

সমাজ মানলে বিধিবহির্ভূত যৌনতার স্বীকৃতি নেই কিন্তু নারীদের আবেগের সঙ্গে খেলা করা পুরুষ মানসিকতাকেও এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে।

'রত্না আমি ও একটি কুকুর' (১৯৮১) গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র আনিসের সংগ্রামী জীবনের অনুষঙ্গে। আনিস নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে। রত্নাদের বাড়িতে পড়াতে যায়। রত্নার প্রতি প্রেমাবেগের তীব্রতা তাকে প্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। গল্পের শুরুতে রত্নার প্রতি আনিসের যে রূপজ মোহের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন লেখক তা গল্পটিকে শিল্পসফল করে তুলেছে আনিসের প্রতি রত্নার যৌনাবেগ এবং পরিণামে তাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করার মধ্য দিয়ে কাহিনি পৌঁছেছে চূড়ান্ত পর্বে। রত্নার সঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে যৌনসঙ্গমে আবদ্ধ হলেও আনিসের প্রতি রত্নার বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে। পোষা কুকুর টেগরার সঙ্গে আনিসকে তুলনা করে রত্না বহুগামিত্বের চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করে আত্মিক মুক্তি অন্বেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। কাহিনির অন্তর্বুনটে লেখকের দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে এ গল্পে।

চরিত্রায়ণ কৌশলে আজাদ শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও উদ্দাম যৌনাচারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। আনিস নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করেছে, অপরদিকে রত্না ধনীর দুলালী, তার মুগ্ধতা 'আনিসকে' ছাপিয়ে 'রানার' প্রতি। পোষা কুকুর টেগরাকেও চরিত্রায়ণ কৌশলে যুক্ত করে মানব মনের অন্তর্বাস্তবতা তুলে ধরেছেন লেখক।

প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ অন্বেষণে বক্রকুটিল ব্যঙ্গের মাধ্যমে এবং মানব মনের গহিনে লুকায়িত কামতৃষ্ণার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এই গল্পে কাহিনি, চরিত্রায়ণ, সংলাপ ও ভাষার ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

'চুরি' (১৯৫৯) গল্পে মাহতাব ও সাজুর মধ্যকার অসম্পূর্ণ প্রেমের শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন কথাশিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ। শ্রেণি সচেতন ভাষা ব্যবহারে মানব মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তুলেছেন আজাদ। মাহতাবের মনে সাজুকে নিয়ে ভাবনায় চিত্রকল্পময় বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে :

> সাজু, বালিশে উপুড় হয়ে মাহতাব আলতোভাবে উচ্চারণ করে এই নাম, শব্দ হয় না, শুধু দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটু কাঁপুনি। বাইরে কার্তিকের রোদের সোনা। গাছের পাতায় ঝোপঝাড়ে তার ঝিকিমিকি। দূরে পানি সরে

[১০০] *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১০৭

যাওয়া গাঙের চিকন বুকে নানা নৌকোর আনাগোনা। ঢেউ উছলে ওঠে। দৃষ্টির কাঠামো থেকে সরে যায় সে চলন্ত ছবি।[১০১]

বিলেত থেকে ফেরত এসে মাহতাব অতীত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন লেখক। অতীত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে প্রবল যৌন অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে। উৎপ্রেক্ষা, অলংকার সৃজিত হয়েছে এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে :

চৈতালি চাঁদের আলোছায়া ভরা সে রাতের আনন্দ বেদনা উত্তেজনা এমনই অপূর্ব, এমনই আশ্চর্য যে এখনো ভাবলে, যেন শীতের রিক্তবনের মধ্য থেকে বসন্তের মতো আস্তে আস্তে জাগরণ ঘটে সমগ্র সত্তার। পুরনো খোলস ঝেড়ে ফেলে ছিপছিপে চিকন চিত্রিত শরীর নিয়ে ফণা উঁচু করে দাঁড়ায় এক সর্প, যার নাম নেই।[১০২]

এখানে যার নাম নেই সেটি যৌনচেতনা যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষতা সহযোগে জাগ্রত হয়। আজাদের বর্ণনায় উপস্থাপিত সর্প যৌনতারই প্রতিরূপ। মাহতাবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাজু যৌনতায় মত্ত হতে চায়নি বরং সাজুর বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারায় কাহিনি শেষ হয়েছে অপূর্ণতায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় শক্তিমান লেখক। আজাদের গল্পে অলংকারবহুল বাক্য, প্রতীকী পরিচর্যা, চেতনাপ্রবাহরীতির পরিচর্যা ও লোকজ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

অনুপ্রাস :

ক. ধাপের পর ধাপ, তার ওপরে ধাপ। [অন্ধকার সিঁড়ি, *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১৪৩]

খ. বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি একটানা; অবিরাম। ঝরঝর; ঝমঝম। [রত্না আমি ও একটি কুকুর, *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৪১]

উপমা :

ক. গর্জনে বজ্রে বিদ্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আসমান, মঙ্গল সুধার মতো বৃষ্টি নামবে। [বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৫]

খ. কপোতের বুকে উষ্ণ প্রবালের মতো কোমল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেলো। [বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৭]

গ. এক জোড়া নীলচোখ। গাঢ় নয় হালকা আকাশি রং, চোখের কালো চিকন কেশের পাপড়ি চতুর্দিকে যেন সংকুচিত সমুদ্রের ঘের। [এক জোড়া নীলচোখ, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১১৬]

---

[১০১] *শ্রেষ্ঠগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[১০২] *শ্রেষ্ঠগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

উৎপ্রেক্ষা :

ক. এক ঝাঁক পাহাড়ী হাঁসের পাখা ঝাপটানি বাজতে থাকে, যেন কানের কাছেই। [জীবন জমিন, *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৫১]

খ. কথা নয় যেন সীসের গুলী। [ধোঁয়া, *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১৭৭]

গ. মর্জিনা যেন অন্যগ্রহের অধিবাসিনী। [যখন সৈকত, *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২১২]

ঘ. স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্ছ্বসিত শব্দের ভয়ংকর সুন্দর রাগিণি [বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১০২]

বক্রোক্তি :

ক. শুয়ে থাকলে কি হবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? [বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৬]

খ. দল করুম না তো কি করুম? বইয়া বইয়া ভেরেন্দা বাজমুরে হারামজাদা। [জীবন জমিন, *শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৫১]

রূপক :

ক. বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালোমেঘ এসে সমস্ত আকাশ চেয়ে ফেলেছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে নদীতে আলোছায়ার লুকোচুরি। [বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১০১]

খ. উত্তর দিক জুড়ে উঁচু হয়ে ওঠা মেঘের কালো আস্তরণটুকু বাদ দিলে বাকি আসমানে তারা আছে; কিন্তু নিচের পরিচিতি পৃথিবীটা কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে মোড়া। [পাশবিক, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১৪৪]

ক-সংখ্যক দৃষ্টান্তে খালেদ ও জোহরার মনোজগতে প্রেম ও কামনার প্রতিচ্ছবি রূপকাশ্রয়ে গ্রথিত করেছেন লেখক।

খ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে ডাকাতদের সম্ভাব্য আক্রমণের পূর্বাভাস হিসেবে নানা পেশায় নিয়োজিত মানুষের জীবনের রূপকাশ্রিত প্রতিচ্ছবি এই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

সমাসোক্তি :

ক. থই থই দুটি নদ ও নদী, সাগর সঙ্গমে মিলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কে আর তাদের আটকাবে? বংশ সমাজ নৈতিকতা? প্রেমের কাছে সর্বকালে সর্বদেশেরই এরা নিঃসহায়। মহল রাজি হয়েছে, আজ রাত্রেই হবে আমাদের সাক্ষাৎকার। প্রথম মিলন, প্রথম অভিসার। [এক জোড়া নীলচোখ, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১২০]

খ. দুপুরবেলা খেতের আলের উপর গিয়ে দাঁড়ালে কলজেটা সহসা ছাৎ করে ওঠে, ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনির মতো হা করে আছে। জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশুশস্যকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। [বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৩]

ক-সংখ্যক দৃষ্টান্তে নদ ও নদীর মিলনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন্ত সত্তার আদলে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে নদ-নদীর উপর জিনাত মহল ও শাহতাবের প্রাণ আরোপ করা হয়েছে।

খ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'বৃষ্টি' গল্পে মাঠকে ডাইনির মাধ্যমে অনাবৃষ্টির প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে।

প্রতীকী পরিচর্যা :

ক. মরা গাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচি ধানপাতার জড়াজড়ি। [বৃষ্টি, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ৯৭]

খ. এখন আবার থই থই করছে মেঘনা, ধারাল হাওয়ায় ঢেউয়ের মিছিল, গ্রামের দিকে ফিরতি যাত্রার বৈঠা বাইতে একেকবার ফুলে ফুলে উঠছে হাত-পায়ের পেশিগুলো, মুখ দিয়ে যেন ছুটবে ফেনা। কিন্তু তবু জুলমত এতটুকু ক্লান্ত নয়। [উজান তরঙ্গে, *নির্বাচিত গল্প*, পৃ. ১২৯]

ক-সংখ্যক দৃষ্টান্তে সৎ ছেলে খালেদের সঙ্গে জোহরার প্রেমাবেগের তীব্রতা ও নতুন পথ চলার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার। স্বামী-স্নেহবঞ্চিত জোহরা সমবয়সি সৎ ছেলে খালেদে অনুভব করেছে ফ্রয়েডীয় লিবিডোতাড়িত মিলনাকাঙ্ক্ষা। এখানে নতুন সম্ভাবনা জাগ্রত হয়েছে।

খ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে যমুনাকে নিয়ে জুলমত ঘর বাঁধার যে স্বপ্ন দেখেছে তারই সম্ভাবনাময় প্রকাশ ঘটেছে। সামাজিক বেড়াজাল ছিন্ন করে নতুন করে সংসার শুরু করার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে লিবিডোতাড়িত প্রেম ও মনস্তত্ত্বের অনুষঙ্গে।

চেতনাপ্রবাহরীতির পরিচর্যা :

১. সমস্ত জগৎটা নিমিষের মধ্যে গভীর তমসায় মুছে গেল। এরপর কী? আত্মহত্যা? মৃত্যু? সমস্ত রচনা পুড়িয়ে ফেলা? সংসার ত্যাগ করা?

বিয়ের উৎসব থেকে পালিয়ে আসার পর নদীতে একটি নৌকার পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে সারারাত ধরে ভাবনার বুদ বুদ, ভোরের দিকে তার মধ্য থেকে একটা জ্যোতির্ময় রেখা যেন ফুটে উঠল। ভাবল কেন সে মরবে? [কবি, পৃ. ১০৭]

২. নিজেকে কি জানে সে? নিঃশব্দ নদীর প্রবাহের মতো শিরায় শিরায় কী বয়ে চলত অজানা। মাঝে মাঝে শুধু জাগে আলোড়ন। [উজান তরঙ্গে পৃ. ১২৭]

৩. তার ভাবনা, কোথায় এল সে? একি জন্ম নাকি মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত রংরাগ? [বৃষ্টি, নির্বাচিত গল্প, পৃ. ১০২]

লোকজ শব্দের ব্যবহার :

ক. যমুনার পাতলা ঠোঁটজোড়া চুলবুল করছিল, কিন্তু বাবু বড্ড কাহিল। [উজান তরঙ্গে, নির্বাচিত গল্প, পৃ. ১২২]

খ. হেই তর্ বৌ নিহিরে বইন পুত্, আত দিতাম না? [পাশবিক, নির্বাচিত গল্প, পৃ. ১৪৭]

গ. শরীরে অদৃশ্য অসুর, মাহতাব ওকে কোলপাঁজা করে তুলল। [চুরি, শ্রেষ্ঠগল্প, পৃ. ৪৮]

ঘ. রইম্যারে খতম কইরা আইছি, দুনিয়া উইল্ডা যাইগ্গা, আমি তরে শাদি করুম পরী। [পরী, নির্বাচিত গল্প, পৃ. ১৫৫]

আলাউদ্দিন আল আজাদ ছোটগল্পে নর-নারীর মধ্যকার প্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানব জীবনের প্রত্যয়ে উদ্দীপিত এঁরা জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে প্রেমের সুমহান জয়গান করেছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন এবং লোকজ অনুষঙ্গে সমাজেরই প্রতিরূপ সাহিত্য উপস্থাপন করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

আলাউদ্দিন আল আজাদের আলোচ্য গল্পগুলোতে নর-নারীর অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রাম্য নিম্নবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও মধ্যবিত্ত জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার নানা অনুষঙ্গ। এই সময়ে রচিত গল্পে কখনো-বা বর্ণনাত্মক, কখনো-বা চিত্রকল্প-উপমার বহুল ব্যবহারে ভাব-বিলাসের উদ্ভাস ঘটেছে। আবার কখনো চেতনাপ্রবাহরীতিতে জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবহ সৃষ্টি করেছে। গল্পের বিন্যাসে তিনি সর্বোচ্চ দৃষ্টি দিয়েছেন। চরিত্রানুযায়ী তিনি গল্পের আঙ্গিক নির্মাণ করেছেন। উল্লেখিত গল্পগুলোতে বাস্তবতার অভিক্ষেপে, মনন ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে মানব মনের নিগূঢ় রহস্যের উদ্‌ঘাটনে এবং নন্দনতাত্ত্বিক শিল্প প্রয়োগে আলাউদ্দিন আল আজাদ নিঃসন্দেহে একজন সফল গল্পকার।

উপসংহার

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ একজন খ্যাতিমান কথাশিল্পী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুধ্যানে তাঁর লেখনী সত্তার জাগরণ ঘটেছে। আশৈশব চিরায়ত সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দর্শন তাঁর সাহিত্যদর্শনের কেন্দ্র থেকে সমাজকে চিত্রায়ণে উৎসাহ দিয়েছে। ব্যক্তিজীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর্লোকে লালিত শিল্পানুভব সহযোগে রচিত তাঁর কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্প ও উপন্যাসে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।

বিশ শতকে পাশ্চাত্যে উদ্ভূত সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব শিল্পসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন মার্কসীয় চেতনায় কিন্তু ফ্রয়েডের অনুসরণে ষাটের দশকে তাঁর রচনায় মানব মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের যে রূপায়ণ ঘটেছে তা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে মানুষের অন্তর্বাস্তবতার সঙ্গে মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহির্বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মার্কসীয় চেতনা দ্বারা কখনো কখনো তাঁর সৃজিত চরিত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে শ্রেণি অধিকার সচেতনতায় সচেষ্ট হয়েছেন। প্রেম ও মনস্তত্ত্ব-নির্ভর গল্প ও উপন্যাস ফ্রয়েডীয় চেতনাতাড়িত প্রেমের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে বাস্তবানুগ পরিস্থিতি সৃজনে লেখকের দক্ষতা তাঁর সমাজচিন্তারই যেন প্রতিফলন। সমাজের অন্তর্গত মানুষের নানামাত্রিক অবস্থার রূপ-অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। ধনিক শ্রেণির শোষণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল যৌনতার স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলোতে। ভূস্বামীদের অচরিতার্থ যৌনতা প্রচেষ্টার বিপরীতে তাদের দীনতা, নিঃসঙ্গতার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে সৃজিত এসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি প্রেম ও মনস্তত্ত্বের জটিল অন্তর্বাস্তবতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মানবীয় প্রেম ও সুস্থ দাম্পত্যের বিপরীতে পাশবিকতার যে প্রচেষ্টা শ্রেণি করেছে তার পরিণাম নির্দেশ করেছেন লেখক। ফ্রয়েডীয় লিবিডোতাড়িত রিরংসাবৃত্তি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে এবং বিপরীতে নতুন পথের বার্তা দিয়েছেন লেখক।

আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ বিশ্লেষণে দেশকাল প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা এবং পাশ্চাত্য দর্শন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভূখণ্ডগত যে বিভাজন সৃষ্টি হয় তার প্রথম উপলব্ধি সম্ভাবনাময় হলেও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং এরপর পঞ্চাশের দশকের দুর্ভিক্ষ শিল্পসাহিত্যকে প্রভাবিত করে। আজাদের কথাসাহিত্য বিশ্লেষণে এ পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের উন্মোচনপর্ব থেকে আলাউদ্দিন আল

আজাদের কথাসাহিত্যে আবির্ভাব পর্যন্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে বিশ্লেষণাত্মক রীতিকে দীর্ঘসময়পটে রচিত কথাসাহিত্যকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের বেড়ে ওঠা, সংগ্রামী দিনের চালচিত্র, পিতামাতাহীন শৈশব দিনের কথা, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে আগমন, ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন, সাহিত্যচর্চার নতুন দিগন্তের উন্মোচন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পড়াশোনা সম্পন্ন করে অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিতকরণ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি প্রাপ্তি ছাড়াও তাঁর সাহিত্যাকাশে আবির্ভাবের সূচনাপর্ব থেকে পঞ্চাশের দশকে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে প্রতিফলিত প্রেম ও মনস্তত্ত্বের চিত্র বিশ্লেষণে নাগরিক মধ্যবিত্তের মনোবাস্তবতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* ছবির অবৈধ মাতৃত্বের স্বরূপ উন্মোচন ঘটেছে জাহেদের অনুসন্ধিৎসু মনোজগতে। শেষ পর্যন্ত ছবি ও জাহেদের সন্তান টুলটুলের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়েছে। ছবি ও টুলটুলের ছবি 'মাদার আর্থ' বসুন্ধরা পুরস্কৃত হয়েছে। *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসে বিলকিস বানুর নিঃসঙ্গতার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল স্বামীর যৌন-নিগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। নবযৌবনের উচ্ছলতা তার যৌনকামনার বহিঃপ্রকাশের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত শুদ্ধসত্তার উত্তরণে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে বিলকিস বানু। এ উপন্যাস কামনাতাড়িত সত্তা থেকে শুদ্ধসত্তার জাগরণে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* উপন্যাসে যৌনতার বিচিত্র রং উপস্থাপিত হয়েছে। এ উপন্যাসে জ্যোৎস্নার জীবনে ঘটে যাওয়া যৌনতা-উদ্ভূত প্রেমের যে রূপায়ণ তা সাদামাটা বলা যেতে পারে। এখানে মানবীয় প্রেমের জাগরণ পরিলক্ষিত হয়নি। এ উপন্যাসে জ্যোৎস্নার প্রেম পূর্ণতা পায়নি বরং রিরংসাবৃত্তির শিকার হয়েছে। যৌনবুভুক্ষ উলফত বানু ও ডা. আহসানের অচরিতার্থ যৌনতার দৃশ্য দেখে জটিল অন্তর্বাস্তবতায় সমর্পিত জ্যোৎস্নার নারী অধিকার সচেতন সত্তার জাগরণ ঘটেছে। *অনূদিত অন্ধকার* উপন্যাসে উচ্চবিত্ত লিংকনের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় নার্স মিতুনের প্রেম সমাজ বাস্তবতায় পূর্ণতা পায়নি বরং মিতুনের আত্মহত্যার মীমাংসার সূত্রে লিংকনের বাবার কামজ প্রভাবের স্থূল প্রকাশের তীব্রতায় খুনিসত্তার জাগরণ লিংকনের মনস্তত্ত্বে জটিল অন্তর্বাস্তবতাময় মুক্তিপ্রয়াসী সত্তা জেগে ওঠে। মানব জীবনের জটিল অন্তর্বাস্তবতা চিত্রণে এ উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* উপন্যাসে সুজার স্মৃতিভাষ্যে বোন জাহানারার সঙ্গে বন্ধু রাজুর কামজ প্রেম এবং ব্যর্থতায় জাহানারার মনোজগতে আত্মহত্যার প্রত্যয় ঘোষিত হলেও ঔপন্যাসিকের সদর্থক চিন্তার আলোকে জাহানারা উপনীত হয়েছে শুদ্ধসত্তার প্রয়াসী মানবিক নারীতে। ভালোবাসাহীন চেতন-অবচেতনে অবস্থানরত জাহানারা ভাতৃস্নেহে মুক্তির পথ খুঁজেছে। সামাজিকভাবে

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবর্গের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে উপন্যাসগুলো ঔপন্যাসিকের মানবীয় চিন্তার প্রতিফলন।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে বিধৃত প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ উন্মোচন প্রসঙ্গে লক্ষ করলে নানা শ্রেণি-পেশার নর-নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ে। তাঁর 'বৃষ্টি' ও 'পরী' গল্পে ধনিক শ্রেণির বৃদ্ধ বয়সের অসময়োচিত যৌনাবেগের তীব্রতার প্রকাশ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত গল্পকার এর বিপরীতে তারুণ্যের যে প্রাণাবেগের উচ্ছলতার প্রকাশ 'জোহরা-খালেদ' কিংবা 'রমু-পরী' চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে তা প্রশংসাবাহী। ধর্মশাসিত সমাজ ব্যবস্থার কঠোর বিপ্রতীপে এরা রচনা করেছে মানবীয় প্রেমের উপাখ্যান। 'কবি' গল্পে অসহিষ্ণু প্রতিকূল সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার সংগ্রামে লিপ্ত মহসিন জয়তুনে আশ্রিত হয়েছে। মহসিনের শ্রমিক সংগঠনে লিপ্ততা যেন লেখকের প্রতিচ্ছবি। সমকামী স্বামীকে ত্যাগ করে মহসিনে আস্থাবান জয়তুন যেন সমাজেরই প্রতিভূ। অপরদিকে 'এক জোড়া নীলচোখ' গল্পে জিনাত মহলের প্রতি আকৃষ্ট চিত্রশিল্পী শাহতাব যৌনাবেগের তীব্রতায় কাজের ঝি আন্নিকে মিলনসঙ্গী করলেও শ্রেণিসচেতনতায় নিম্নবর্গের এ নারীকে সংসারে স্থান দেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একই চিত্র লক্ষ করা যায় 'রত্না আমি ও একটি কুকুর' গল্পে রত্নার প্রতি মুগ্ধতা ও পারস্পরিক প্রেমে কামজ প্রভাব থাকলেও তা শ্রেণিগত পার্থক্য তথা ধনী-গরিবের সামাজিক বৈসাদৃশ্য ও জাত্যাভিমানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। গৃহশিক্ষক আনিস ধনীর দুলালী রত্নাকে পেতে চাইলেও কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে রত্না শ্রেণিসচেতন হয়ে উঠেছে। 'ধোঁয়া' গল্পেও অনেকটা সাদৃশ্যমূলক চরিত্রায়ণ কৌশলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মেয়ে কালী চা বাগানের কর্মকর্তা আবিদের কামনা-বাসনার সঙ্গী হলেও স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি। আবিদের ঔরসজাত সন্তানের গর্ভধারিণী মা হিসেবে কালী কর্তৃক উচ্চারিত কথাবার্তায়ই স্পষ্ট হয় যে সে তার সন্তানকে কুলি বানাবে। এটা যেন আবিদের শ্রেণিসচেতন সত্তায় চপেটাঘাত। 'চুরি' গল্পে মাহতাবের অন্তর্বাস্তবতায় তারই প্রিয়তমা সাজুর কাজের ঝিকে নিয়ে অস্বস্তি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। আইনজীবী মাহতাবকে শ্রেণিসচেতন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। 'জীবন জমিন' নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রামী জীবনের চালচিত্র। নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত হানিফ মনোবিকলনের চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করে পুত্রবধূকে কামবাসনার সঙ্গী করে আদিপাপ করেছে। অবদমিত কামের যে স্থূল রূপের বহিঃপ্রকাশ এ গল্পে রূপায়িত হয়েছে তা সমাজ বাস্তবতারই যেন প্রতীকী চিত্র। 'যখন সৈকত' গল্পটি কলিম ও মর্জিনার দাম্পত্য প্রেম ও মনোজাগতিক অন্তর্বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি যেন। সমাজ-বিরুদ্ধ পরিবেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত নারীর আখ্যান এ গল্প। ক্যান্সারে আক্রান্ত স্বামী শুশ্রূষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপাজনে লিপ্ত মর্জিনা নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দেহলোলুপ সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবানুগ চিত্র উপস্থাপন করে সমাজ সচেতনতারই যেন বার্তা দিয়েছেন এ গল্পে। 'অন্ধকার সিঁড়ি' গল্পে বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভাইয়ের চাকরি প্রাপ্তির পূর্বাপর কাহিনির মধ্য দিয়ে দেহলোলুপ সমাজ ব্যবস্থার চিত্রই যেন তুলে ধরেছেন। 'উজান তরঙ্গে' ও 'পাশবিক' গল্প দুটি মানবীয় প্রেমের আখ্যান। তীব্রতম যৌনাবেগ যেন দেহকে কেন্দ্র করে দেহাতীত শুদ্ধ প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'উজান তরঙ্গে'র জুলমত-যমুনা ও 'পাশবিক' গল্পের কুতুব ডাকাত-জয়নাব এরা ধর্মীয় বেড়াজাল ছিন্ন করে, সামাজিক শ্রেণি-পেশাকে অতিক্রম করে প্রেমের শুদ্ধতায় আশ্রিত হয়েছে। গল্পকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার চিত্রায়ণে তার দক্ষতা দেখিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস ও গল্পে বিধৃত প্রেম ও মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে গল্প ও উপন্যাসের প্লট, চরিত্রায়ণ, ভাষা, অলংকার ও পরিচর্যারীতি ব্যবহারে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেম ও মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যারীতির অনুপুঙ্খ ব্যবহারে তাঁর গল্প ও উপন্যাস অভিনবত্ব লাভ করেছে। চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের আলোকে অন্তর্বাস্তবতাময় উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাবে তাঁর চরিত্রেরা কামবাসনায় উদ্দীপিত হলেও শেষ পর্যন্ত শুদ্ধসত্তার জাগরণে মানবীয়তায় পদার্পণ করেছে চেনা জগতে।

লেখকের পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ, আশৈশব পঠন-পাঠনে অভ্যস্ততা, স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন তাঁর চিন্তন প্রক্রিয়াকে শানিত করেছে। তাছাড়া দেশকাল, সমাজ ও রাজনীতিসচেতন শিল্পী হিসেবে তাঁর কথাসাহিত্য যেন বাস্তবেরই প্রতিফলন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব শীর্ষক অভিসন্দর্ভে আলাউদ্দিন আল আজাদের কথাসাহিত্যের গঠন-কৌশল এবং পরিচর্যারীতিতে কীভাবে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব বিচিত্র ভাবানুষঙ্গে মূর্তরূপ পেয়েছে তারই রেখাচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রেম যেমন বহু বর্ণবৈভবময়, তরঙ্গায়িত, নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকার এবং রিরংসায় বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অভিনতুনও বটে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশকালে যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিলেন, তা সাহিত্যসাধনায় অর্ধশতাব্দী সময়কাল পেরিয়ে তাঁর রচনা শিল্পীমনের গভীর ব্যাপ্তি ও পরিধির আলোকে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। দেশবিভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্য ধারার অন্যতম সব্যসাচী লেখক হিসেবে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য রচনার ফলে তিনি পাঠকমহলে চিরজাগরূক থাকবেন বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. জীবন বৃত্তান্ত

আলাউদ্দিন আল আজাদ ২২শে বৈশাখ ১৩৩৯ ইংরেজি ৬ই মে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গাজী আবদুস সোবহান এবং মায়ের নাম আমেনা খাতুন। মাতামহ শাহ আমানত আলী ছিলেন মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের একজন কবিয়াল। আজাদের বড় চার বোন মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা করতেন। বোন কমলার কাছে আজাদের হাতেখড়ি হয়। আলাউদ্দিন আল আজাদের ঢাকার নিবাস ছিল–রত্নদ্বীপ, বাড়ি-১৩, রোড-১৬, সেক্টর-৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

১৯৩৪ — মাত্র দেড় বছর বয়সে আজাদ তার মাকে হারান। অগ্রজ বোনেদের স্নেহে বড় হয়ে ওঠেন আজাদ। আশৈশব নিঃসঙ্গপ্রিয়তাই তার জীবনের শক্তি।

১৯৩৭ — রামনগর জুনিয়র মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু করেন।

১৯৪০ — আজাদ *ঠাকুরমার ঝুলি* ও *বিষাদসিন্ধু* গ্রন্থ দুটি পাঠ করেন।

১৯৪৩ — নারায়ণপুর শরাফতউল্লাহ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণিতে পড়াশোনা শুরু করেন।

১৯৪৭ — দেশভাগের বছরে দারিদ্র্যপীড়িত আজাদ ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। এইচএসসি পাস করেন। ঢাকা কলেজে আজাদের সংস্কৃতি চর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়। ঢাকা কলেজ সংসদের সাহিত্য সম্পাদক ও বার্ষিকী সম্পাদক হয়েছিলেন আজাদ।

১৯৪৯ — আজাদ 'নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলন'-এ যোগ দিতে কলকাতা যান এবং সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

১৯৫০ — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দেই আজাদের গ্রন্থ *জেগে আছি* প্রকাশিত হয়।

১৯৫১ — গল্পগ্রন্থ *ধানসিঁড়ি* প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ — ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতার মিছিলে ছিলেন আজাদ। সালাম, রফিক, বরকত মারা গেলেও ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান আজাদ।

১৯৫৩ — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে অনার্স পাস করেন।

১৯৫৪ — বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ — ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। *শিল্পীর সাধনা* নামে এই বছরেই তার বই বের হয়।

১৯৫৬ — ঢাকা শহরে ফিরে আসেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৫৭-১৯৫৯ — আজাদ এ সময়কালে যুবলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন; নাট্যগ্রন্থ *মরক্কোর জাদুঘর* প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ — *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৬১ — *মানচিত্র* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৬২ — মানব মনস্তত্ত্বের উপাখ্যান নিয়ে রচিত *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* এবং ইউনেসকো পুরস্কারপ্রাপ্ত *কর্ণফুলী* উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ — লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন ও কবিতা'র ওপর পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৭১ — আত্মজীবনী *ফেরারী ডায়েরি* রচনা করেন।

১৯৭২ — ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর কর্মময় জীবনে মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের শিক্ষাদূত; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি উপদেষ্টা (১৯৮২); চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর (১৯৮৯-৯৬) এবং চেয়ারম্যান (১৯৯০-৯২); এছাড়া নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (১৯৮৯-৯২); রয়েল ব্রিটিশ এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ডের ফেলো (১৯৮০); ভিজিটিং প্রফেসর, ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩-৮৪); বাংলা একাডেমি, কার্যপরিষদের সদস্য (১৯৯৯), চলচ্চিত্র অনুদান তথ্য কমিটি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের চেয়ারম্যান (১৯৯৫), সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, নজরুল ইনস্টিটিউট; মেম্বার, একাডেমিক কাউন্সিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এরকম খ্যাতনামা বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল আলাউদ্দিন আল আজাদের।

১৯৮৬ — *খসড়া কাগজ*, *শ্যামল ছায়ার সংবাদ*, *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি* উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হয়।

১৯৯০ — উপন্যাস *স্বাগতম ভালোবাসা* প্রকাশিত হয়।

১৯৯২ — প্রবন্ধগ্রন্থ : *নজরুল গবেষণা : ধারা ও প্রকৃতি*, জীবনীগ্রন্থ *হামিদুর রহমান*। উপন্যাস *স্বপ্নশিলা*, *পুরানা পল্টন* ও *অপর যোদ্ধারা* প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ — *প্রিয় প্রিন্স* উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৯৭ — *বিশৃঙ্খলা* উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৯৮ — *ঠিকানা ছিলো না*, *তোমাকে যদি না পাই* উপন্যাসদ্বয় প্রকাশিত হয়।

২০০৮ — গুরুতর অসুস্থ হন।

২০০৯ — ৩রা জুলাই, বাংলা ১৪১৬ সনের ১৯শে আষাঢ় আজাদ মৃত্যুবরণ করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের জীবনের সংগ্রাম থেকে শুরু করে শক্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে আপন পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন অলংকরণে তাঁর স্বীয় প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়।

সাহিত্যচর্চার বাইরে বাংলাদেশ টেলিভিশন (BTV)-এ 'রত্নদীপ' নামে আলেখ্যানুষ্ঠান (১৯৭২-৭৬) উপস্থাপনা করেছেন। আরেকটি সাহিত্যমূলক আলেখ্যানুষ্ঠান 'চয়ন' উপস্থাপনা করেছেন আজাদ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ একুশে পদক; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক; শেরে বাংলা সাহিত্য পদক; অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, লেখিকা সংঘ পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন।

নানামাত্রিক সৃজনশীলতার অপূর্ব সমন্বয় আজাদ। আজাদের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য হারায় সৃজনশীল এক কথাসাহিত্যিককে; দেশ হারায় প্রগতিশীল মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীকে।

খ. গ্রন্থপঞ্জি

আলোচিত উপন্যাস

১. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

২. শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯২

৩. জ্যোৎস্নার অজানা জীবন : স্বনির্বাচিত উপন্যাস, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০

৪. যেখানে দাঁড়িয়ে আছি : স্বনির্বাচিত উপন্যাস, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০০০

৫. অনূদিত অন্ধকার : স্বনির্বাচিত উপন্যাস, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০০০

৬. অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি : স্বনির্বাচিত উপন্যাস, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০০০

৭. শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : গতিধারা, ঢাকা, ২০০১

৮. স্বনির্বাচিত উপন্যাস : গতিধারা, ঢাকা, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য রচনা

ছোটগল্প

১. শ্রেষ্ঠগল্প : গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লি., ঢাকা, ১৯৯৯

২. শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প : গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯

৩. নির্বাচিত গল্প : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮

প্রবন্ধ গ্রন্থ

১. শিল্পীর সাধনা : সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৭

২. সাহিত্য সমালোচনা : ইতিবৃত্ত ও পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা

৩. শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ : ঢাকা, ১৯৯৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

গ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

১. অশ্রুকুমার শিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

২. অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, সূচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪

৩. আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

৪. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬

৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ, *সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০১

৬. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৯৯

৭. আবু জাফর, *সাহিত্যে সমাজভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

৮. ড. ইবাইস আমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প : বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পরূপ*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯

৯. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, *বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ*, বর্ণালি, কলকাতা, ১৯৮৯

১০. গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯

১১. গিয়াস শামীম, *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

১২. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

১৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮

১৪. ফরিদা সুলতানা, *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

১৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮

১৬. ভূঁইয়া ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

১৭. মনসুর মুসা, *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮

১৮. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিকের কথাসাহিত্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯

১৯. রণেশ দাশগুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩

২০. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

২১. রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০

২২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০১

২৩. শহীদ ইকবাল, *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩

২৪. শিল্পী খানম, *আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে জীবনবোধের রূপ-রূপান্তর*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৯

২৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮০

২৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলা বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

২৭. সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৮. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

২৯. হাফিজুর রহমান, *আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ/জার্নাল

1. E.M. Forster, *Aspects of Novel*, first published by Edward Arnold, Penguin Books, 1970.
2. Games C Colemon, *Abnormal Psychology and Modern Life*, London, 1980.
3. Leon Edel, *The Modern Psychological Novel*, Gloucester, Edition 1972.
4. William Peden (editor), *Short fiction : Shape and substance*, Houghton Miffin Com Ltd., USA, 1971.
5. M H Abrams, *A Glossary of Literary Terms*, USA, Edition : 1981.
6. M. D. Mahroof Hossain, Psychoanalytic Theory used in English Literature : A descriptive study global Journal of human Social-Science, Global Journal, USA, 2017.
7. Virginia Woolf, The common reader (1925) 'Modern fiction,' Oxford Essential Quotations (4th ed.) : Susan Ratcliffe, online version publish-2016.

ঙ. জার্নাল, পত্রপত্রিকা, ই-জার্নাল, ই-পত্রিকা

১. তপন জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও ইংরেজি সাহিত্য*, কলকাতা, ২০২০/ই-জার্নাল/ www.jaladarchi.com/2020/09/sigmund.freud-and englsih literature. p. 3.

২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, অমর একুশে বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৭, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রদত্ত বক্তৃতা।